গান বাজনার দলিল

চেরাগে জান শরীফ

ড. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী

সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা ও দলিল

সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা ও দলিল

চেরাগে জান শরীফ
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
প্রযত্নে : বে-ঈমান হোমিও হল
১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা), ঢাকা—১২০৫
ফোন : ০১৯১১৫৯৭৭৮০, ০১৭১১১২৮১৬৯
www.babajahangir.com

প্রকাশক: নাহিদ শামসেত্তাব্রিজ, মিমিনাজ, বেদম ওয়ারসি, সিক্তলমুনা সিতু, লায়না ইসলাম, ইরম কলন্দর, নিটশে আহমেদ, তামামি আহমেদ, শানাই আহমেদ।

(সুফিবাদ প্রকাশনালয়ের পক্ষে)
গ্রাম : চুনকুটিয়া, ডাক : শুভাঢ্যা,
থানা : কেরানীগঞ্জ, জেলা : ঢাকা
ফোন : ০১৯১১৫৯৭৭৮০, ০১৭১১১২৮১৬৯

প্রকাশকাল : ২৫ আগস্ট ২০১৬
স্বত্ব : মুক্ত
শব্দবিন্যাস : ঈশিন কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০
মুদ্রণ : নিউ জাহিদ আর্টপ্রেস, ৩০ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
বাঁধাই : সোহান এন্টারপ্রাইজ, ১৪ চৌধুরী মার্কেট, নয়াবাজার, ঢাকা
দাম : ১০০.০০ টাকা মাত্র

সুফিবাদ প্রকাশনালয় হতে প্রকাশিত

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী রচিত গ্রন্থাবলি

- *মারেফতের গোপন কথা*
- *মারেফতের গোপন আলাপ*
- *মারেফতের বাণী*
- *সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ– ১ম খণ্ড*
- *সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ– ২য় খণ্ড*
- *সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ– ৩য় খণ্ড*
- *ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য*
- *নিহ্নবে চিত্তদাহ : সুফিবাদ সার্বজনীন*
- *শরিয়তি শয়তান মারেফতি শয়তান*
- *কোরানে সালাতের কথা*
- *কোরান ও হাদিসের দৃষ্টিতে জাকাত*
- *রোজা ও ইফতার*
- *কোরবানি ও হজ*
- *শরিয়তি সেজদা মারেফতি সেজদা*
- *আল্লাহ কোথায় থাকে*
- *সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা*
- *কোরানুল মাজিদ (হুবহু অনুবাদ ও কিছু ব্যাখ্যা)*
  (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

লেখকের প্রকাশিত বইয়ের পরিবেশক

সদর প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
বাণী বুক ডিপো, বাবুল টাওয়ার ৩৫, বাংলাবাজার, ঢাকা।
বই বিচিত্রা, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
বিউটি বুক হাউস, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা।
ঢাকা টাউন লাইব্রেরি, ৩/১ বাংলাবাজার, মল্লিক টাওয়ার, ঢাকা।
বাঙলায়ন, ৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
প্রথমা, পাঠক সমাবেশ, বইপত্র, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।
একুশে, প্যাপিরাস, বিদিত, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।
সৃজনী, ক্যামলট বুক স্টল, কমলাপুর রেল স্টেশন, ঢাকা।
সাগর পাবলিশার্স, বেইলি রোড, ঢাকা।
বিদ্যা ভবন, বেইলি রোড, ঢাকা।
সূফী বুক ডিপো, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
সুমন লাইব্রেরী, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
গ্রন্থকলি, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
বুক মার্ট, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
নিউ বুক সোসাইটি, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
এ. বি. বুকস, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
বুক স্টল, নিউ মার্কেট, ঢাকা।
কাশফী, শান্তিনগর, ঢাকা।
ঢাকা লাইব্রেরী ও স্টেশনারী, শান্তিনগর, ঢাকা।

এছাড়াও সারাদেশের রেলওয়েস্টেশন বুকস্টলগুলোতে এবং অভিজাত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোনো দামে বিক্রি অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোনো প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবেও না। কারণ, এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্য যে কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তাছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোনো সাময়িকীতে এবং প্রিন্টার্স ইলেকট্রনিক বা যে কোনো মাধ্যমে এই বইয়ের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোনো কারো নামে এক সাথে অথবা ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোনো প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোনোদিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন, তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা ও দলিল

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন কিছু একটা লিখতে হচ্ছে যা পড়ে অনেকেই হাসবে। সেই হাসির বিষয়বস্তুটি হল, ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে সঙ্গীত কি হালাল না হারাম? এই অপদার্থ প্রবন্ধটি লেখতে হচ্ছে একটা বিশেষ কারণে। সমাজের কিছু পঙ্গু মন-মানসিকতা নিয়ে সকল যুগেই বাধা আসতো। সঙ্গীতের বিষয়টি নিয়েও পঙ্গু মন-মানসিকতার পরিচয় ধর্মের নামে আমরা দেখতে পাই আজও। ভাল্লুকের হাতে খোন্তা দেবার মত বিপদ ডেকে আনে, যারা ধর্মের বিশাল ভূমির এক কোণে বসে সব কিছুর সিদ্ধান্ত চোখের পলকে নিয়ে বসে। এ জন্যই বোধ হয় বলা হয় থাকে যে, একজন অপদার্থ পাঁচ মিনিটে যতটি প্রশ্ন করতে পারেন ততটির উত্তর একজন জ্ঞানী পাঁচ দিনেও দিতে হিমশিম খায়। এই জাতীয় অপদার্থদের দ্বারা সাধারণ মানুষেরা ভুল করতে অনেকটা বাধ্য হয়েছে। কারণ, এ যুগে সব কিছু গবেষণা করে দেখার মত সময় নেই। সমগ্র কোরানে মদ, শুকর, সুদ আর মৃত প্রাণীর মাংস হারাম করার যে রকম প্রকাশ্য ঘোষণা করা হয়েছে, সঙ্গীত বিষয়টির উপর কোনো কথাই বলা হয় নি। সুতরাং আমাদের আশ্রয় নিতে হবে মহানবির বাণীসমূহে তথা হাদিসে। হাদিসের কথা উঠলেই আবার প্রশ্ন দেখা দেয় যে ইহা সত্যিই মহানবি বলছেন কিনা। সঙ্গীত হালাল হবার যথেষ্ট দলিল হাদিস হতে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই দলিলগুলো গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ, কিছু মোল্লারা সঙ্গীত হারাম হবার হাদিস নাকি

দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আমি সঙ্গীত হারাম হবার মত হাদিস একটিও আজ পর্যন্ত পাইনি। ধরে নিলাম সঙ্গীত হারাম হবার হাদিস পাওয়া গেল, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? পরস্পর বিরোধী কথার সমাবেশ দেখতে পাবো। মহানবি কি পরস্পর বিরোধী কথা বলতে পারেন? যদি সঙ্গীত হারাম হবার একটিমাত্র হাদিসও পাওয়া যেত তাহলে অবশ্যই তা তুলে ধরতাম। আসলে কিছু কাঠমোল্লারা গবেষণা করে সাব্যস্ত করেছে যে সঙ্গীত হারাম। তাদের গবেষণার জন্য অনেক ধন্যবাদ। অধম লেখকের এই ধন্যবাদ তাদের কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা পড়ার মত যন্ত্রণায় ক্ষুধার্ত সিংহের মত গর্জন করে লেজ নাড়তে শুরু করে দেবেন। কারণ, এদের নকশা-নমুনা কী রকম অধম লেখক ভাল করেই জানে। কারণ আমিও একদিন এই শিয়ালদের দলের এক শিয়াল ছিলাম। অবশ্য বলতে লজ্জা নেই যে, এখনো আমি শিয়ালই, তবে ধোপার নীল জলে চুবান খেয়ে গায়ের রংটা কেবল নীল রূপধারণ করেছে। রাজসভায় বসালে সেই আদি শব্দটার চিৎকারই আশা করতে পারেন। আর সেই চিৎকারটাই হল এই অসভ্য প্রবন্ধটির অবতারণা।

প্রথমেই বলতে চাই বিশ্ববিখ্যাত দুইজন মহাপুরুষের কথা। প্রথমে যাঁর নামটি বলবো তাঁর সম্বন্ধে এত বড় সাংঘাতিক মন্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের সমস্ত বইগুলোও যদি হারিয়ে যায় তবু কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি ইমাম গাজ্জালীর *এহিয়ায়ে উলুম উদ্দিন* নামক বিরাট বইটি বেঁচে থাকে। ইমাম গাজ্জালীর পর যার নামটি বলবো তাঁর লিখিত গ্রন্থটিকে তিনি নিজেই মানুষের রচিত কোরান বলে ঘোষণা করেছেন এবং তা একমাত্র ওহাবিরা এবং তাদের অনুসারীরা বাদে সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। তাঁর নাম মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী এবং সেই অমর গ্রন্'টির নাম *মসনভী*। এই দুইজন মহাপুরুষ সঙ্গীতকে হালাল বলে কেবল ঘোষণাই করেন নি, বরং নিজেরাও সঙ্গীত শ্রবণ করতেন। এমনকি

সঙ্গীতের তালে তালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচতেন। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী তো তাঁর সাথীদের নিয়ে সঙ্গীত শ্রবণে এমন বিভোর হয়ে নাচতে থাকতেন যে কখনো কখনো বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতেন। এখন সঙ্গীত যদি কিছু কাঠমোল্লাদের কাছে হারাম হয়ে থাকে এবং স্ত্রী তালাক হয়ে যাবার ফতোয়া দেওয়া হয়, তাহলে এই দুই মহাপুরুষের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? তাছাড়া এই অত্যাধুনিক যুগে যারা সঙ্গীতকে হারাম বলে মনে করেন তাদের বাড়িতে বাড়িতে খানাতল্লাশি দিলে কি রেডিও, সিডি এবং টেলিভিশন সেট পাওয়া যাবে না? এ রকম পাগলামি কথাবার্তার দ্বারা ওজন বাড়াতে গিয়ে সমাজকে বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই দিতে পারেন নি তারা। কিছু সংখ্যক কাঠমোল্লারা এবং বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ওহাবি মোল্লারা এবং তাদের অনুসারীরা এই দুই মহাপুরুষের নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। অবশ্য উপরে উপরে এই দুই মহাপুরুষকে ভাল বলবে, কিন্তু ভেতরের ঘৃণাটি যে বোবার মত মনের ভেতর গর্জন করছে তা কিছুদিন এদের সাথে থাকলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদের সৌদি আরব নামক দেশটিতে রাজকীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রচার বিভাগের মাধ্যমে রেডিও, টেলিভিশনে সঙ্গীত পরিবেশন কি করা হয় না? কাগজের টাকা, যাকে আরবিতে রিয়েল বলা হয়, সেই রিয়েলের উপর বাদশাদের ছবিগুলো কি দেখতে পান না? আপনাদের বেলায় সব হালাল হয়ে যায় আর আমাদের বেলায় কেবল ফতোয়ার তরবারি দেখানো হয়। আমাদের জাতীয় কবির ভাস্কর্যকে মূর্তিপূজার নাম দিতে পারেন আর আপনাদের রিয়েলের উপর বাদশাদের সুন্দর সুন্দর ছবিগুলোয় কি মূর্তিপূজা হয় না? কী চমৎকার ফতোয়া! আপনাদের আমরা মোটেই অশ্রদ্ধা করি না। কিন্তু এ রকম কথাবার্তায় যদি শ্রদ্ধা হারিয়ে যেতে চায় তার জন্য দায়ী কারা? আপনারা আমাদেরকে মিসকিন বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ

করেন, কিন্তু কোরান কি মিসকিনের প্রতি ভালবাসা দেখাতে বার বার আদেশ করেনি? ফকিরের চেয়ে যে অধম তাকেই মিসকিন বলা হয়। আর সেই মিসকিন বলে ঠাট্টা করাটার কোনো একটি দলিল কোরান-হাদিস হতে দেখাতে পারবেন? অবস্থার চাপেই একদিন যারা মিসকিন তারা হয় আমির আর যারা আমির তারাই হয় মিসকিন। জানি না, এটা কি ভবের লীলাখেলা, না পুঁজিবাদের অভিশাপের নর্দমা; যে নর্দমা দিয়ে একদিন কমিউনিস্টদের আনতে হয় না, বরং আপনিই এসে পড়ে। এর জন্য দায়ী কারা? আর সেই জন্যই প্রথমে আমাকে সঙ্গীত বিষয়টিতে একটি অপদার্থ এবং পঙ্গু প্রবন্ধ বলতে হয়েছে। আমাকে এ রকম একটি অখাদ্য প্রবন্ধ রচনা করতে হবে, ইহা ভাবিনি। কারণ, 'ইংরেজি পড়া হারাম' ফতোয়া শোনার মত আমাদের পরের বংশধরেরা সঙ্গীতের বিষয়টি পড়ে হাসবে।

সঙ্গীত হালাল না হারাম এ বিষয়ের উপর কিছু লেখার আগে কয়েকটি বিষয়ের উপর সামান্য কথা বলতে চাই। আর সেই বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল কোরান বলছে, 'তোমার আগে যে সকল রসুল পাঠিয়েছি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর'। কোরানের এই একটি বাক্যকে যদি আমরা ভাল করে তলিয়ে দেখি তাহলে কিন্তু প্রশ্ন উঠে। প্রথম প্রশ্নটি হল, মহানবির আগের অনেক রসুলেরা তখন জীবিত ছিলেন না। অথবা কোরান মহানবিকে আদেশ দিচ্ছে যে, অতীতের রসুলদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন যে এই জাতীয় কাজের আদেশ-নিষেধ করা হয়েছে কিনা। যদি মহানবির পূর্বের রসুলেরা সত্যিই মৃত হয়ে থাকেন তাহলে কোরানের এই জিজ্ঞেস করার আদেশটির কি কোনো মূল্য থাকে? পূর্বের রসুলেরা যদি সত্যিই মৃত হয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা মহানবির কথা কেমন করে শুনবেন? মহানবির পূর্বে বহু রসুলকে বহুস্থানে কবর দেওয়া হয়েছে, অথচ তাদের প্রত্যেকের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করার কথা

কোরান বলেনি। কারণ, মাটির দেহটি আত্মা নয়। আবার দেহটি যে স্থানে রাখা হয়েছে উহাও কবর নয়। তবে সমাজের দৃষ্টিতে মাটির গর্তটিকেই কবর বলে থাকি। তাই কোনো রসুলই মাটির দেহ নামক কবরে যেমন আবদ্ধ নন, তেমনি মাটির গর্তেও সীমাবদ্ধ নন। এজন্যই মহানবিকে কোরান আদেশ করছে যে, আপনার পূর্বের রসুলদের যে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। জিজ্ঞেস করার অর্থই হল, উত্তর পাওয়া। সুতরাং পূর্বের রসুলদের নিকট হতে উত্তর পাবার অর্থই হল, তাঁরা মৃত নন। কোনো এক ঘটনার পরিবেশে মহানবিকে হজরত উমর ফারুক (রা.) বলেছিলেন যে,আপনি প্রাণহীন মৃতের সঙ্গে কেন কথা বলছেন? উত্তরে মহানবি বললেন, তারা তোমার চেয়েও বেশি শোনে। শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইয়েরা, এটা যুক্তির যুগ। সাইনবোর্ডের দিন চলে গেছে। যদিও স্বীকার করতে বাধ্য যে, যুক্তি সব কিছুর সমাধান দিতে না পারলেও বিবেকের চোখ দুটো খুলে দিতে পারে। কোরানের এই বাক্য হতে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। আর সেটি হল মহানবির পূর্বের রসুলেরা যে যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সবার উত্তর দেবার ক্ষমতা থাকলে আমাদের মহানবি কি জীবিত নন? তিনি কি একটি দেহের মধ্যেই আবদ্ধ? তিনি কি আমাদের কথা শুনতে পান না? তিনি মিলাদ মাহ্ফিলে আগমন করলে কি দাঁড়িয়ে কেয়াম করা অবশ্য কর্তব্য নয়? তাঁর আগমনে বসে বসে নবিকে সালাম দেওয়া কি জঘন্য বেয়াদবি নয়? ক্লাসে, কোর্টে, রাষ্ট্র প্রধানের আগমনে আমরা কি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করি না? এই দুনিয়ার সামান্য ব্যাপারে যেখানে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করি সেখানে মহানবির আগমনে বসে বসে কেয়াম করা কি অন্যায় নয়? সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে বুকে হাত রেখে বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে একবার নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখুন না আপনার বিবেক কী উত্তর দেয়। আর একটি প্রশ্ন হয়তো উঠতে পারে যে,

একসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে লক্ষ লক্ষ মিলাদ মাহফিল যেখানে একই সময়ে হচ্ছে সেখানে মহানবির পক্ষে এত মাহফিলে একই সঙ্গে কী করে আগমন সম্ভবপর? এক আজরাইল যদি সর্বজীবের প্রাণহরণ করতে পারে বলে বিশ্বাস করেন এবং এক শয়তানের যদি সব মানুষকে ধোঁকা দেবার ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন, তাহলে মহানবি কি মাত্র কয়েক লক্ষ মিলাদ মাহফিলে আগমন করতে পারেন না? যে মহানবিকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ কিছুই সৃষ্টি করতেন না সেই প্রিয় মহানবির ক্ষমতা কি আজরাইল আর শয়তান হতেও কম বলতে চান? যদি তাই মনে করে থাকেন তাহলে বলার কিছু নেই। কারণ, কোরান বলছে, ধর্মের মধ্যে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ নেই। আবার কোরান বলছে, তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। সুতরাং আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন এবং এই করাটাও একটি তকদিরের লিখন।

সঙ্গীত বিষয়টির বেলাতেও মতবিরোধ আছে। তবে যারা সঙ্গীতকে হারাম বলতে চান তাদেরকে একটি অনুরোধ করতে চাই যে, অন্তত হারাম না বলে পছন্দ হয় না বলাটাই ভাল। তারপর গ্রহণ করা না-করা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত ব্যাপার এজন্যই বলতে হল যে, পৃথিবীতে এমন কোনো মতবাদ আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি যা সবাই একবাক্যে মেনে নিতে পেরেছে। এই পারা না-পারাটাও তকদিরের লিখন। সমর্থন করাও তকদির এবং বিরোধিতা করাও তকদির। যেমন শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইয়েরা আল্লাহ্র অলীদের কেরামতে বিশ্বাস করেন না, অথচ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানের লাথি-গুঁতোগুলো একান্ত বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করেন। যদি বিজ্ঞানী বলে কেউ না থাকতো তাহলে তের হাত জিহ্বা বের করে যে বিরোধিতা করা হত এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোরানে বর্ণিত আসহাবে কাহাফ তিনশত নয় বছর গুহার ভেতর ঘুমিয়ে ছিলেন। এই আসহাবে কাহাফ কিন্তু নবি ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বনি

ইস্রাইলদের অলী। না খেয়ে এভাবে এতটি বছর ঘুমিয়ে থাকাটা কি অলীর কেরামত নয়? পানাহার বিহনে এতদিন কী করে বেঁচে থাকলেন? তাদের শরীরকে এতদিনেও মাটি গ্রাস করতে পারলো না কেন? তাহলে কেবল নবিদের শরীরকেই মাটির জন্য হারাম করা হয়নি, বরং আল্লাহ্‌র অলীদের শরীরও যে মাটির জন্য হারাম করা হয়েছে কোরানে বর্ণিত সূরা কাহাফ হতে এর পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাংলার বিখ্যাত মাওলানা হাফেজ মঈনুল ইসলাম সাহেব রচিত *তবলীগ দর্পণ* বইটির ব্যাপক এবং বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক। এই *তবলীগ দর্পণ* বইটি পড়লে আপনি এমন কিছু অজানা তথ্য জানতে পারবেন যা আপনাকে অবাক এবং বিস্ময়ে অভিভূত করবে।

নাস্তিক ভাইদেরকে কটাক্ষ করে বলছি না, কারণ সৃজনের যে অগণিত রহস্য, সেই রহস্যের একটি রহস্য যে আপনারাও। আপনারা যে এই রহস্য-মঞ্চের এক কোণে না থাকলে কিছুটা শূন্যতা বিরাজ করবে। তাই নাস্তিক হওয়াটাও একটি তকদিরের লিখন। আপনাদের নাস্তিক্যবাদের দর্শন এবং ক্ষুরধার যুক্তিগুলোর যত কদরই হোক না কেন, যত মূল্যবান বলেই গ্রহণীয় হোক না কেন, কিন্তু একটা কথা আপনাদেরকে বার বার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই পৃথিবীতে মৃত্যু নামক অপ্রিয় সত্যটি যতদিন থাকছে, ততদিন মৃত্যুর কথা ভেবে মানুষের মনটি কেঁদে যাবে; যতদিন মৃত্যুযন্ত্রণার প্রশ্নটি বুকের মাঝে আহত পাখির মত ছটফট করবে, ততদিন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র উপর হতে বিশ্বাসটি কোনো শক্তিই চিরতরে মুছে দিতে পারে না এবং পারবেও না। বাংলাদেশের দুই তিনজন ঘোর নাস্তিকের শেষ জীবনের কয়টি কথা আজও কিছুটা অবাক করে বৈকি। একজন বিখ্যাত নাস্তিক কবি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থেকে নামাজ, রোজা এবং প্রতিদিন কোরান তেলাওয়াত করে গেছেন। 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার', এই প্রবাদটি যদি মনে

করতে চাই তাহলে কি অন্যায় হবে? মহানবির সঙ্গে যুদ্ধে এক গাজি যে জাহান্নামে যাবে বলে মহানবি বলেছিলেন এবং তাতে সাহাবারা কিছুক্ষণের তরে হয়তো অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু যখন সেই গাজি আত্মহত্যা করেছিল তখন মহানবির বাণিটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল।

আর একজন নামজাদা সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন, যাকে শিক্ষিত মহলের সবাই ঘোর নাস্তিক বলে জানতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তিনি মহানবির প্রশংসায় অনেকগুলো কবিতা লিখে গেছেন। বিশ্বাস করতে না পেরে হাতের লেখা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সেই নাস্তিক কবিরই হাতের লিখা। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির এক জাঁদরেল নেতা, যার নাম বললে সবাই চিনবেন, সেই নেতার সঙ্গে কাওয়ালি শোনার ভাগ্য হয়েছিল এই অধম লেখকের। আমি প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলাম বৈ কি! পরে মনে মনে ভাবলাম, হয়তো কোন বন্ধুর মান রাখতে গিয়ে তিনি কাওয়ালি শুনতে এসেছেন। কাওয়ালি শুরু হল। বাঘের মত যেমন গলার স্বর তেমনি মধুর মত শুনতে। কাওয়াল গাইতে শুরু করলেন, 'ওহি *কিবলা ওহি কিবলা নুমা হ্যায়–জো মেরে সামনে হ্যায় উহ্ খোদা হ্যায়। বাকা কাহ্তে হ্যায় জিস্‌কো উহ্ খোদা হ্যায়–ফানা সে পাক জাতে কিবরিয়া হ্যায়। হাম্ হ্যায় কাফির ইশ্‌ককে কাফির হামারা ইশ্‌ক হ্যায়। বালাগুল্ উলা বে কামালিহি কাসাফুদ্দোজা বে জামালিহি– হাসানুতজামীয়ু খেসালিহি সাল্‌লু আলাইয়ে ওয়ালিহি।*' সহসা সেই নেতার দিকে চেয়ে আমি একদম চমকে উঠলাম। একি দেখছি! সত্যিই দেখছি তো? হ্যাঁ, চেয়ে দেখছি সেই নেতার দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপছে আর পাথরের মত নিশ্চল মুখটি রক্তবর্ণ ধারণ করে আছে। সেই অভাবনীয় দৃশ্যটি অধম লেখক জীবনেও হয়তো ভুলে যাবে না। আর সেই সময় মহানবির একটি বাণি বার বার মনে পড়ছিল।

মহানবি একজন সাহাবাকে এই বলে প্রশ্ন করেছেন যে, 'কালেমা পাঠ করার পরও তাকে হত্যা কেন করলে?' সাহাবা বলেছিলেন, 'হুজুর, সে কেবল মুখেই কালেমা পাঠ করেছিল।' মহানবি বললেন, 'তোমার তরবারির অগ্রভাগ কি তার হৃদয়ের ভেতরও প্রবেশ করেছিল?' অধম লেখক অজ্ঞ, মহাপাপী এবং ফেরাউনের চেয়েও অধম। সুতরাং আমার মন্তব্য করার কোনো অধিকার নেই। কেবল দৃশ্যের বর্ণনা করতে পারি মাত্র।

একটা সাংঘাতিক ধরনের গোপন কথা বলতে চাই। আর সেটা হল, ভয় এবং প্রেম দুটো সবদিক দিয়েই আলাদা। যে ভয় করে সে প্রেম করতে পারে না, আর যে প্রেম করে সে ভয় করতে জানে না। যদি মনটাকে একটি ঘর বলি এবং সেই ঘরের যদি একটি দরজা ও একটি জানালা থাকে তাহলে বলতে হয় যে, যদি মনের সেই দরজা দিয়ে ভয় ঢুকে পড়ে তাহলে প্রেম জানালা দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য এবং যদি মনের সেই দরজাটি দিয়ে প্রেম ঢুকে পড়ে তাহলে ভয় জানালা দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য। ভয়ের মধ্যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করার সংবাদ থাকতে বাধ্য। কারণ, সুখ ও দুঃখের প্রশ্নে ভয় জড়িয়ে থাকে। তাই প্রেমিক ভয়ের পরোয়া করে না, কিন্তু ভয় জানে না প্রেমের মধ্যে কী আনন্দ লুকিয়ে আছে। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে সে আল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণরূপে কীভাবে চাইতে হয় সেই চাওয়াটা জানে না। কারণ সে চায় আল্লাহ্‌র তৈরি বেহেস্তের ভোগবিলাস এবং জাহান্নামের আগুন থেকে কেমন করে নিজেকে রক্ষা করা যাবে সেই ইবাদত-বন্দেগি করতে। সুতরাং এই ধরনের ইবাদত-বন্দেগিকে আল্লাহ্‌র ইবাদত না বলে পুরস্কার এবং শাস্তির ইবাদত বলা হয়। কারণ, বেহেস্ত এবং দোজখ হতে রেহাই পাবার ইবাদত করা হলে আল্লাহ্‌র বদলে পুরস্কার ও শাস্তিরই ইবাদত করা হয়ে যায়।

সঙ্গীত বিষয়টি লেখতে হচ্ছে অনেক বন্ধুদের অনুরোধে। অনেকটা বাধ্য হয়ে একান্ত অনিচ্ছায়। কসাই যখন দুটো পশুর সামনে আর

একটি পশু জবাই করছে তখন অন্য দুটো পশুর অবস্থা যেমন হয়, এই সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধটি লেখতে গিয়ে আমার অবস্থাও অনেকটা সে রকম। এখানে একটি কথা বললে আমি জানি যে সেই কথাটি অহঙ্কারের ছকে ফেলে আমাকে যা-তা বলতে পারবেন। কিন্তু না বলেও উপায় নেই। আর সেই কথাটি হল, আমি পাকিস্তান আমলে অনেক বিষয় নিয়ে মোল্লাদের সঙ্গে বাহাস করতাম। যদি বলি বাহাসে কোন মোল্লাই বেশিক্ষণ অধম লেখকের সঙ্গে টিকে থাকতে পারতো না, তাহলে অহঙ্কারের ব্যাকরণে ফেলতে পারেন, কিন্তু অহঙ্কার হলেও ইহা অতি অপ্রিয় সত্য কথা।

আমার জীবনের একটি স্মরণীয় বাহাসের বয়ান করেই আসল বিষয়ে হাত দেবো। বাহাসটি এজন্য স্মরণীয় যে, পাকিস্তানের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাওলানা, যার নাম সে সময় প্রায় সবাই জানতেন, সেই বিখ্যাত মাওলানা মোস্তফা সৈয়দ আল মাদানীর সঙ্গে আমার বাহাস হয়। যার কবর লালবাগ মাদ্রাসায় দেওয়া হয়েছে। সেই বাহাসের আয়োজন ছিল এক দক্ষ-যজ্ঞ ব্যাপার। একদিকে বিচারকমণ্ডলি অপর দিকে হাজার হাজার শ্রোতার দল মাঠে বসে আছে। ১৯৬২ সালের জুন মাসে ঢাকা জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলার দিঘির পাড় নামক বাজারের মাঠে সেই বাহাসের আয়োজন করা হয়েছিল। তখন দিঘির পাড় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব আরব আলী হালদার সাহেব। উনি আমাকে সেইদিনের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান আল্লামা আবুল হাশিম সাহেবের পরামর্শে বাহাসের জন্য নিয়ে যান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মাওলানা মাদানী সম্পূর্ণরূপে হেরে যান এবং তিনি রাগে আমার জামার কলার চেপে ধরে প্রশ্ন করেন যে, পায়খানা করার পর পানি খরচ করার মাসলা জানিস? আর কী! মাঠের হাজার হাজার শ্রোতারা মাদানীর উপর এমনই ক্ষেপে গেলেন যে, সে দৃশ্য বড়ই করুণ। কিল- থাপ্পড়, জুতা-সেন্ডেল দিয়ে মারা শুরু করে দিলেন।

অবশেষে আমিই ধমক দিয়ে এবং বুঝিয়ে শ্রোতাদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলাম এবং তাড়াতাড়ি মাদানী সাহেবকে সভা হতে অন্যস্থানে সরিয়ে দিলাম। সেই থেকে যে কোনো বাহাসে অধম লেখকের থাকার কথা উঠলেই মাদানী সাহেব ভূত দেখার মত ভয় করতেন। অথচ অধম লেখকের মত জাহেল, মূর্খ আর মহাপাপী খুব কমই পাবেন। এই এতগুলো কথা বলার একটিই উদ্দেশ্য যে, সঙ্গীত বিষয়টি নিয়ে অন্য আর একস্থানে বাহাস হয়েছিল এবং সেই বাহাসেরই সামান্য কিছু তুলে ধরলাম। কারণ, বিস্তারিত লিখে বিশেষ করে এই অখাদ্য বিষয়ের উপর বই মোটা করে এই আধুনিক যুগে কোনো লাভ নেই। *তিরমিজি শরিফ, এবনে মাজা* এবং আরো কয়টি হাদিসের বইতে আছে যে, হজরত সালমান ফারসি (রা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ কোরানে যা হালাল করেছেন উহাকে হালাল বলে এবং হারাম ওটাকেই বলা হয় যা আল্লাহ্ কোরানে হারাম করেছেন। আর যে বিষয়ের উপর কিছুই বলেন নি উহা আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর আল্লাহ্ কিছুই বলেন নি সেই বিষয়টি কারো কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে না এবং এটাকেই মোবাহ্ বলা হয়। কারণ, এটা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

ফতোয়ায়ে কাজিখান এবং *দোররে মোখতার* নামক এবং আরো কয়টি বিখ্যাত ফতোয়ার কেতাবে স্পষ্ট লেখা আছে যে, প্রতিটি জিনিসই বলতে গেলে মোবাহ্ বা হালাল। অর্থাৎ যাহা আল্লাহ্ স্পষ্ট হারাম বলে ঘোষণা করেছেন উহা ছাড়া সব কিছুই মোবাহ বা হালাল। কিন্তু যদি হালাল জিনিসের সাথে হারামকে মিশিয়ে ফেলা হয় কেবল তখনই হারাম হয়। নতুবা হালালই থাকে। তাছাড়া ভাল নিয়তে সঙ্গীত জায়েজ আছে। অতএব মন দেখে ফতোয়া দেবার কোনো মেশিন মোল্লাদের কাছে নেই। যদিও কথায় কথায় মুসলমানদেরকে কাফের ও মোশরেক ফতোয়া দেওয়াটা ওহাবি

মোল্লাদের একটা অতি সাধারণ স্বভাব। মহানবি বলেছেন, 'প্রত্যেক বিষয়েরই বাহির এবং ভেতর আছে, সে রকম কোরানেরও বাহির ও ভেতর আছে।' হজরত ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, 'ফেকাহ বিষয় মানুষের বাহিরকে শুদ্ধ করে আর মারেফত মানুষের হৃদয়কে শুদ্ধ করে।'

হোস্‌সামী নামক ওসুলের কেতাবে আছে যে, 'যখন কারণ থাকবে না তখন আদেশও থাকবে না।' হজরত ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) বলেন, 'ভাল লোক তার ভাল মন হতে ভাল কথা বের করে, আর খারাপ লোক তার খারাপ মন হতে খারাপ কথা বের করে।'

হেদায়া নামক কেতাবে বলা হয়েছে যে, 'যে বিষয়ে কোরানের পরিষ্কার আদেশ পাওয়া যায় না, সেই বিষয়টির উপর হারাম ফতোয়া দেওয়া যাবে না। অলীরা ছাড়া অপরের জন্য সঙ্গীত হারাম যারা বলেন, তারাও ভুল করছেন। ইহার প্রধান কারণ হল, শরিয়ত অনুসারে যা হালাল তা সবার জন্যই হালাল এবং যা হারাম তা সকলের জন্যই হারাম।' হজরত মোজাদ্দেদে আল ফেসানী তাঁর রচিত *মাক্‌তুবাত*-এ বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র অপ্রিয় অথবা যা তুষ্ট করতে পারে না এ রকম কোনো কাজই অলীদের দ্বারা হতে পারে না। কারণ, এরা আল্লাহ্‌র অলী। আল্লাহ্‌র পছন্দ নয় এমন সব কাজ হতে তিনিই তাঁর অলীদেরকে সব সময় রক্ষা করে থাকেন।'

হজরত ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) বলেন, 'যে গোসল করেছে তার পা ছাড়া আর কিছুই ধুইবার দরকার নেই। কারণ, তার আর সমস্ত কিছু পরিষ্কার আছে।' দোররে মোখতার নামক কেতাবে বলা হয়েছে যে, 'অলী হবার লক্ষণ হল যে, সব সময় পাপ কাজ হতে বিরত ও ভাল কাজে লেগে থাকা। এই দুটো লক্ষণ যার মধ্যে নেই সে অলী হতে পারবে না। অতএব অলীদের প্রকৃত অনুসারীরা ভুল পথে যেতে পারে না।'

হজরত ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) বলেন, 'যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, তাহলে দুজনেই গর্তে পড়ে। যদি তোমরা মন ফিরিয়ে শিশুদের মত না হও তবে কোনো মতেই বেহেস্তে যেতে পারবে না।'

যে সকল সাহাবারা সঙ্গীত শুনতেন তাদের নামের একটি লম্বা তালিকা আমরা দেখতে পাই হজরত জাফর ইবনে কামাল উদ্দিনের রচিত *এত্তেবা ফি আহ্কাসিমা* নামক কেতাবের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় এবং এই কেতাবে বলা হয়েছে যে, মহানবি তাঁর সাহাবাদের নিয়ে সঙ্গীত শুনেছেন এবং তা সনদসহ সহি হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে। *হাকিকাতোস্‌সেমা* নামক কেতাবে এবং হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত আলেম ও ইমাম হজরত আবদুল গণি নাবলুসি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সঙ্গীতকে ঘৃণার সহিত একদম হারাম বলে, সে যেন বলছে, মহানবি হারাম কাজে লিপ্ত ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্ মিনহা)।'

অধম লেখক যে সকল কেতাবের নামগুলো বলছি সেই কেতাবগুলো সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ অনুবাদ করলেই থলির বেড়াল সুরসুর করে বেরিয়ে পরবে এবং সাধারণ মুসলমানদের চোখগুলো খুলে যাবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কি এই মহান কাজগুলোতে হাত দেবেন?

শামি নামক বিখ্যাত হানাফি মাজহাবের কেতাবে বলা হয়েছে, 'সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। নফস পরস্তির নিয়তে এবং হারাম কৌতুক-হাসি, খেল-তামাসার নিয়তে সঙ্গীতকে হারাম বলা হয়েছে। যে হারাম উদ্দেশ্যে সঙ্গীত হারাম হবে সেই ব্যাপারে বাজনাও হারাম হবে। আবার যে কারণে সঙ্গীত হালাল সেই কারণে বাজনাও হালাল হবে।' এখানে কেবল মাছিমারা কেরানির মত যে কেতাবে যা বলা হয়েছে তাই তুলে ধরলাম। হয়তো যুক্তির খাতিরে বলতে পারতাম যে, মদ হারাম বলে মদের বোতলটি আর হারাম হয় না। কারণ, ধুয়ে পরিষ্কার করে ঐ বোতলে পানি রেখে পান করা যায়। তাতে কি আপত্তি করার কিছু আছে?

যাক সে কথা। এখন আমরা সহি হাদিসে সঙ্গীত বিষয়ে কী বলা হয়েছে সেটাই আলোচনা করবো। *বোখারি শরিফ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের সাত শত তেহাত্তর পৃষ্ঠায় এবং *তিরমিজি শরিফ*-এর এক শত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে হজরত রোবাই (রা.) বলেছেন, 'আমি আমার স্বামীর ঘরে যখন নূতন বিবাহিতা হয়ে ঢুকলাম, তখন মহানবি এসে বিছানায় এমনভাবে বসলেন যেমন তুমি আমার কাছে বসেছ। আমাদের পরিবারের নব যুবতীরা দফ বাজাতেছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা, যারা বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন, তাদের বীরত্বের গান গাইতেছিলেন। তাদের মাঝে একজন গাইতে শুরু করলো যে, আমাদের সঙ্গে একজন নবি আছেন যিনি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন। তখন মহানবি বললেন যে, এটা না বলে পূর্বে যা গাইতেছিলে সেটাই গাও।' এই হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক রকম কথা এবং শক্ত যুক্তি দাঁড় করানো যায়। তবে খুব ছোট করে বলতে চাই যে, দেড় হাজার বছর আগে সেই মরুদেশে কয় প্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল অথবা কয় প্রকার বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল এবং সেই বাদ্যযন্ত্রগুলোর নাম কী এবং কেমন করে বাজানো হত? আজকের যুগে যত বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, এবং দিনে দিনেই নূতন নূতন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে, তার কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ বাদ্যযন্ত্রও কি সেই দেড় হাজার বছর আগে এবং বিশেষ করে মরুদেশে প্রচলন ছিল? না, মোটেই না। সুতরাং যে কয়টি বাদ্যযন্ত্র তখন বাজানো হত সেটাই ছিল তাদের সম্বল। এর বাইরে কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকলে এবং বাজাতে জানলে কি তারা বাজাতেন না? মহানবি দফ বাজিয়ে যেহেতু গান শুনেছেন সেইহেতু আমাদেরকেও ঐ একই বাজনা বাজিয়ে গান শুনতে হবে বলে যদি কেউ ফতোয়া দেন তাহলে আমরা যদি তাকে প্রশ্ন করি যে, মহানবি উট-ঘোড়ায় উঠে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গিয়েছেন, সুতরাং আমাদেরও বাস, ট্রেন,

উড়োজাহাজে উঠে ভ্রমণ করা যাবে না। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, এ রকম আজব ফতোয়া কিন্তু অনেক মোল্লারা আগেই দিয়ে ফেলেছেন। এসব মোল্লারা চমৎকার চিজ এবং আমাদের দেখতে ইচ্ছে করে। তাই এদেরকে চিড়িয়াখানার একটি ঘরে রেখে দেখার আহ্বান জানালে কিন্তু অনেক টাকা উপার্জন করা যাবে। আরো মজার কথা হল, যেহেতু এটা বিশেষ করে *বোখারি শরিফ*-এর হাদিস তাই না পারে ফেলে দিতে আর না পারে গ্রহণ করতে। তাই এই হাদিসটির যে কত রকমের আজব আজব বয়ানের ঝুড়ি পাবেন তা দেখলে আপনি বোবার মত থমকে যাবেন। অথচ কাঁচের মত পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মহানবি গান কেবল দফ নামক বাদ্যসহই শুনতেন না বরং অন্য রকম করে গাইবার আদেশটিও স্পষ্ট লক্ষ করতে পারি এই গুরুত্বপূর্ণ হাদিসটিতে। সমাজে কিছু ছাগল-পাগল না থাকলে সমাজের লোকেরা যে, 'ছাগল-পাগল' শব্দটি চিরতরে ভুলে যাবে। যেমন পৃথিবী থেকে অনেক প্রাণীর অস্তিত্ব চিরতরে হারিয়ে গেছে, যাদের নাম আমরা আজ নিতে পারি না। তাই এদেরকে দোষ দেবেন না। কারণ, এটা যে তাদের তকদিরের লিখন। তকদিরের লিখন যে খণ্ডানো যায় না, কেবলমাত্র অলীয়ে কামেলের বিশেষ রহমত ছাড়া। এটা যখন আমরা জানি তা হলে কি বলার কিছু থাকে? বামন হয়ে যখন চাঁদ ধরার হামকি-ধমকি শুরু করে দেয়, কেবল তখনই কিছু একটা বলতে বাধ্য হতে হয়। কারণ, এতে সমাজের সাধারণ মানুষগুলোর ভুল করার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য *লোময়াত শরহে মেশ্‌কাত* নামক কেতাবে এটুকু অন্ততঃ বলা হয়েছে যে, 'যখন দফ বাজানো জায়েজ প্রমাণিত হল তখন সঙ্গীত জায়েজ হবে না কেন?' আবার এই হাদিসের উপর এক অপূর্ব ডিজাইনের ব্যাখ্যা করেছেন, *মেরকাত* নামক কেতাবের লেখক মোল্লা আলী কারী হানাফি সাহেব। তিনি বলেছেন যে, গান ও দফ বাজানো-ঈদে এবং অন্যান্য উৎসবে–হাদিস দিয়ে জায়েজ

যেখানে প্রমাণিত হল এবং ইহা কেবল বিবাহ ও বাসর রাতে বাজানো জায়েজ হবে। তারপরের হাদিসটি তুলে ধরছি। এই হাদিসটি *তিরমিজি শরিফ*-এর প্রথম খণ্ডের একশত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন যে, মহানবি বলেছেন, 'তোমরা বিবাহকে ঘোষণা কর এবং মসজিদে বিবাহ পড়াও এবং অনেকগুলো দফ বাজিয়ে উহাকে প্রচার কর।' এই হাদিসটিতে আমরা মহানবির তিনটি আদেশ পাচ্ছি : প্রথম আদেশটি হল, 'তোমরা বিবাহকে ঘোষণা কর।' বিবাহকে ঘোষণার অর্থ হল, যতটুকু পার ততটুকু প্রচার করে দাও যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এই জানিয়ে দেবার কথা হয়তো এ জন্যই বলা হয়েছে যে, সবাই জানুক যে তারা বিবাহিত। সুতরাং না জানালে হয়তো অনেকে অনেক রকম বিরূপ মন্তব্য করতে পারে। অনেকে হয়তো মনে করতে পারে যে, বিবাহের পূর্ব হতেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, নইলে সন্তান এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করে হল? এ রকম নানান ধরনের কথা, সে যুগের কথা না হয় বাদই দিলাম, এই নব্য আধুনিক যুগেও শোনা যায়। তাই যাতে কোনো ধরনের কান-কথার অবতারণা না হয়, বলা হল, তোমরা বিবাহকে ঘোষণা কর। তারপরের আদেশটিও প্রচারমূলক আদেশ এবং পবিত্রতার ভয়ভীতি যেন থাকে সেদিকটিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আদেশটি হল, 'মসজিদে বিবাহ পড়াও'। মসজিদ আল্লাহ্‌র বিশেষ অথবা খাস ঘর। এই মসজিদ ঘরে সবাই নামাজ পড়তে আসে এবং সবাই না আসলেও অনেকেই আসে, তাই মসজিদ ঘরে বিবাহ পড়ানো হলে বিবাহের কথাটি সহজেই প্রচার হয়ে যায়। তারপরের কথা হল, আল্লাহ্‌র মসজিদে বিবাহ পড়ানো হলে যুবক এবং যুবতী উভয়ের মনে একটি ভয় থাকবে যে, আমরা যে উভয়ে উভয়কে বরণ করে নিতে যাচ্ছি উহা এমনই একস্থানে অঙ্গীকার করানো হচ্ছে, যে স্থানটিকে সবাই আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ বলে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয়।

এমনিতেই যে কোনো বিষয়ের উপর সত্যতা যাচাইয়ের প্রশ্ন উঠলে মসজিদ ঘরে শপথ করে বলার প্রশ্ন উঠলে মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটি ভয়ভীতি আসে। কারণ, মসজিদ ঘরের ভেতর মিথ্যা শপথ করতে ভয় লাগার কথাই। বিশেষ করে যারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। অবশ্য কিছু পাষণ্ড প্রকৃতির মানুষ আছে যারা সব যুগেই সবখানেই মিথ্যা শপথ করে এবং তাদের পরিণতি একদিক না একদিক দিয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এ রকম পাষণ্ডদের করুণ পরিণতির দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। তাই মহানবি আদেশ করছেন যে, 'মসজিদে বিবাহ পড়াও'। শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদের যত দোষই থাক না কেন, কিন্তু তারা মসজিদে বিবাহ পড়াবেই। অবশ্য আধুনিক কালে কমবেশি সব মাজহাবের মানুষেরাই কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাব অথবা নামিদামি হোটেলে বিবাহের কাজটি সেরে ফেলে। ওহাবিদের এই নিয়মটি দেখে হানাফি ভাইদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কারণ, আমরা কেবল ওহাবি ভাইদেরকে নসিহতই করে গেলাম এবং তাদের কোনো কিছুই ভাল না বলে প্রচার করি। অনেকটা ইরান-ইরাকের যুদ্ধের মত। ইরানের সব দোষ আর ইরাক হল আবে জমজমের পানির মত পবিত্র। আমি অধম লেখক শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদেরকে কম গালাগালি করি নি, কিন্তু তাদের সব আকিদাই যে খারাপ আর সুন্নিরা সবাই তুলসি পাতা ধোয়া জলের মত পবিত্র সে রকম তো লিখে গেলাম। কথায় বলে, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

এবার হাদিসটির তৃতীয় আদেশটি হল, 'অনেকগুলো দফ বাজিয়ে উহাকে প্রচার কর।' বিবাহটির প্রচারের জন্য দফ বাজানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশটির মধ্যে দফের সংখ্যা দেওয়া হয়নি বরং বলা হয়েছে অনেকগুলো দফ বাজাতে। এই অনেকগুলো দফ বাজাবার উদ্দেশ্য কী? অনেকগুলো দফ বাজালে বাজনার শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং এতে অনেক দূরের মানুষেরাও

বিবাহের কথাটি জানতে পারবে। আসলে বিবাহের প্রচারটিই এখানে মুখ্য এবং দফ বাজানোটা হল গৌণ।

অবশ্য আরেকটি হাদিস আমরা *তিরমিজি, নেসায়ী, আহম্মদ* এবং *ইবনে মাজা শরিফ* হতে পাই। হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হাতেব আজমীর ছেলে মোহাম্মদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মহানবিকে বলতে শুনেছেন যে, 'হালাল এবং হারাম বিবাহের পার্থক্য গান ও দফ দ্বারা হয়।' এই হাদিসটিকে কেন্দ্র করে কিছু সুন্নি মাওলানা (অধম লেখকও এই দলেরই একজন) অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি অনেক সময় করে ফেলেন। তারা এই হাদিসটিকে সামনে রেখে যারা বিবাহে কোনো গানবাদ্য করে না তাদের বিবাহ শরিয়ত মত হয়নি বলে ঘোষণা করেন এবং আরো অনেক আজেবাজে কথা বলে ফেলেন। ওহাবিরা না হয় কথায় কথায় কাফের মুশরিক ফতোয়া দেয়, তাই বলে কি আমাদেরকেও তাই করতে হবে? কে কাফের আর কে মুনাফেক এ রকম সিদ্ধান্ত আমরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেলি দেখে আমাদের অবস্থাটা কেমন হয়েছে সেটা কি দুরবিন দিয়ে দেখতে হবে? কাফের-মুশরিক না বলে ইহা তকদিরের লিখন বললে কি সুন্দর শোনায় না? কারণ, সমস্ত জ্ঞানের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং আল্লাহ্ই জানেন যে, কে কাফের কে মুশরিক আর কে মুসলমান। এতবড় বিচারের ভারটি নেওয়া কি উচিত, না আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল? কেবলমাত্র যারা জুলুম, অত্যাচার আর নির্মম শোষণ করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনেছে এবং এই নির্মম শোষণের পরিণতিতে জনতার হাতে দেওয়া হয় ভিক্ষাভাণ্ড, বেকারত্ব ইত্যাদি– তাদেরকে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে কেবল কাফের এবং মুশরিক ফতোয়া দেওয়াকে সামান্যই মনে করি। বরং তারা কাফেরের চেয়েও বড় কাফের এবং মুশরিকের চেয়েও বড় মুশরিক এবং তাগুত-পূজা তথা মূর্তিপূজা করার চেয়েও বড় মূর্তিপূজারক। যদিও খালি চোখে তারা মূর্তিপূজা

করে না, কিন্তু নিয়তের প্রশ্নে তাদের চেয়ে বড় মূর্তি পূজারক কয়জন আছে, যাদের মোটর গাড়িটাকে রোদ-বৃষ্টি হতে রক্ষা করার জন্য ইট দিয়ে ঘর বানানো হয় আর সেই ঘরে রাখা হয় মোটর গাড়িটাকে; অথচ তাদেরই মত মানুষ, যাদের ফুটপাতে ছেলে-মেয়ে নিয়ে রাত কাটাতে হয়। এরাই হল একদম পাক্কা কাফের, মুনাফেক, মুশরিক এবং মূর্তিপূজারী। এই বিষয়টি নিয়ে অধম লেখক পৃথিবীর যে কোনো বড় আলেমের সঙ্গে বাহাস করতে প্রস্তুত এবং বাহাসের শর্ত থাকবে যে, যে হেরে যাবে তার মাথা ঐ বাহাসের মাহফিলে জনতার সামনে কেটে ফেলা হবে। যদি অহঙ্কার করার সামান্যতম সুযোগ ইসলামে থাকতো তাহলে বাংলা ভাষায় না বলে উর্দুতে সিংহের মত গর্জন করে বলতাম, 'দুনিয়ামে হ্যায় কোয়ি মাকা লাল, তো আও মেরে সাথ বাহাস কারো।' এবং ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টার মধ্যে বাহাসের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দিতাম।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, কেবলমাত্র এই দুটো হাদিসের উপর ভিত্তি করেই হজরত ইমাম মালেক দফ বাজিয়ে বিবাহ ঘোষণা করাকে ওয়াজেব এবং হজরত ইমাম আবু হানিফা এবং হজরত ইমাম শাফেয়ী মোস্তাহাব বলেছেন।

নেসায়ী শরিফ, *তিরমিজি শরিফ*, আবদুল অহাব শারানীর রচিত *কাশফোল গোমাহ* নামক কিতাবে এবং *বাবো এয়লান ফিন্‌নেকাহ*-এর দুইশত পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় এই হাদিসটি এভাবে রচিত হয়েছে যে, হজরত সায়াদের ছেলে আমের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, একদিন আমি বিবাহ উপলক্ষে কোরায়জা বিন কাব এবং আবু মাসউদ আনসারীর বাসায় গিয়েছিলাম। তখন সেখানে প্রতিবেশিনী মেয়েরা রাগ-রাগিনীর সহিত গান বাজনা করতেছিল এবং সেখানে বসে হজরত কায়াবের ছেলে কোরায়জা ও আবি মাসুদুল আনসারী শুনতেছিলেন। আমি সেই দুই সাহাবাকে উদ্দেশ করে বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ্ (আ.)-এর বদরী সাহাবারা, আপনাদের সামনে এটা কী

হচ্ছে?' তারা বললেন, 'যদি ইচ্ছা হয় তো আমাদের সাথে বসে গান শুনুন, আর যদি আপনাদের পছন্দ না হয় তো চলে যেতে পারেন। নিশ্চয়ই হজরত রসুল করিম (আ.) আমাদেরকে গানবাদ্য করতে বিবাহ উৎসবে অনুমতি দিয়েছেন।' আমরা জানি যে, মদিনার আনসার সাহাবারা মহানবিকে কতটুকু ভালবাসতেন এবং মহানবির জন্য তাদের জীবন দিতেও কোন পরোয়া করতেন না। সেই আনসারদের মধ্যে দু'জন সাহাবা কোনো এক বিবাহ উৎসবে গানবাজনা শুনতেছিলেন। যখন হজরত আমের (রা.) সেই দুই মহান সাহাবাকে গানবাদ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তাঁরা বললেন যে, মহানবি তাদেরকে বিবাহ উৎসবে গানবাদ্য করার অনুমতি দিয়েছেন। যে দুইজন সাহাবা সাক্ষ্যদান করলেন যে, ইহা মহানবির অনুমতিক্রমেই করা হচ্ছে, তাঁরা কি মামুলি সাহাবা? অবশ্য আমাদের দৃষ্টিতে কোনো সাহাবাই মামুলি নন, কিন্তু মর্যাদার প্রশ্নে এই দুই সাহাবার ভাগ্য এতই ভাল ছিল যে, তাঁরা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং একদিকে তাঁরা যেমন মহান সাহাবা অন্যদিকে তাঁরা ছিলেন গাজি। বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব ইসলামের উপর কতখানি ছিল সেটা বুঝিয়ে না দিলেও সবাই কমবেশি বুঝতে পারে। সুতরাং মহানবির দেওয়া অনুমতির কথা মিথ্যা হতে পারে না। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে, গানবাদ্য শোনাটা নিজের রুচির উপর নির্ভর করছে। তাই বলা হল যে, পছন্দ হলে শুনতে পারেন, না হলে চলে যেতে পারেন। এখানে বাধ্যবাধকতার উপদেশ দেওয়া হয়নি। আর একটি হাদিস যাহা *বোখারি শরিফ*-এর প্রথম খণ্ডের চতুর্থ ভাগে এবং *কেতাবুল ঈদাইন*-এর একশত ত্রিশ পৃষ্ঠায় এবং *মোসলেম শরিফ*-এর প্রথম খণ্ডের দুই শত একানব্বই পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন যে, 'এক সময় আমার স্বামী হজরত রসুলুল্লাহ্ (আ.) আমার ঘরে ঢুকলেন, তখন আমার সামনে দুটি

যুবতী গায়িকা বোয়াস যুদ্ধের গান দফ বাজিয়ে এবং হাততালি দিয়ে গাইতেছিল। রাসুলুল্লাহ্ (আ.) অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন। এই সময় হজরত আবু বকর (রা.) ঘরে ঢুকলেন এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললেন যে, "শয়তানের বাজনা রসুলের নিকট!" তখন হজরত রসুল করিম (আ.) হজরত আবু বকরকে (রা.) লক্ষ্য করে বললেন, "এদেরকে ছেড়ে দাও।" (অর্থাৎ এদেরকে দফ বাজিয়ে গাইতে দাও)। তারপর রসুল করিম (আ.) অন্যমনস্ক হলে আমার (মা আয়েশার) ইশারায় তারা বেরিয়ে গেলেন।'

এই হাদিসটিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদিও মহানবি মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন, কিন্তু দফ বাজিয়ে এবং হাততালি দিয়ে যে গান গাইতেছিল এবং তা মা আয়েশা (রা.) শুনছিলেন ইহাতে কোনো প্রকার সন্দেহ এবং প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি ইহা হারাম হত তাহলে কখনোই মহানবি সামান্যতম প্রশ্রয় দিতে পারতেন না। কারণ, হারাম যত ছোটই হোক না কেন উহা হারাম। খোদা না করুন, যদি ঐ দুই যুবতী মা আয়েশার (রা.) সামনে মদ পান করতো এবং মহানবি ঘরে প্রবেশ করে যদি সেই দৃশ্য দেখতে পেতেন তাহলে অবশ্যই প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কেবল মানাই করতেন না, বরং ঐ দুই যুবতীকে ঘর হতে তাড়িয়ে দেওয়া হত এবং মা আয়েশা (রা:)-কেও অনেক কিছু অবশ্যই শুনতে হতো।

হজরত আবু বকর (রা.) মহানবির অত্যন্ত প্রিয় সাহাবা ছিলেন। মহানবি মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে আছেন দেখে তাঁর মনে কষ্ট হয়েছে বলেই আপন কন্যাকে ধমক দিয়েছেন। কিন্তু মহানবি হজরত আবু বকরকে কিছু বলতে বারণ করে দিলেন। তারপর এক সময় মা আয়েশার (রা.) আদেশেই দুই যুবতী গায়িকা চলে গেলেন। এখানে হয়তো কেউ ভুল করতে পারেন এই বলে যে, যেহেতু মা আয়েশার বয়স কম ছিল তাই মহানবি সেই বয়সের দিকে লক্ষ্য করে কিছু

বলেননি। কিন্তু প্রশ্ন হল মা আয়েশার বয়স কম হতে পারে, তাই বলে তিনি চার-পাঁচ বছরের শিশুটি অবশ্যই ছিলেন না। তা ছাড়া মহানবির কথা না হয় বাদই দিলাম, ধরুন আমাদের যে কারো ছয় সাত বছরের বালক অথবা বালিকার হাতে যদি মদের বোতল এবং সামনে গস্নাস-ভরা মদ দেখতে পাই তাহলে কি চিৎকার করে উঠবো না? বাধা দেওয়া তো মামুলি ব্যাপার, তার চেয়েও কি চরম কোনো ব্যবস্থা নেব না? কারণ, আমরা সবাই জানি যে মদ হারাম।

বোখারি এবং *মোসলেম শরিফ*-এর ঈদের নামাজের অধ্যায়ে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন–আনসার গোত্রের দুইজন যুবতী মেয়ে ঈদের দিনে দফ বাজিয়ে এবং হাততালি দিয়ে গান গাইতেছিল। হজরত রসুল করিম (আ.) নিজের চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে শুয়েছিলেন। হজরত আবু বকর (রা.) হজরত আয়েশা সিদ্দিকার সামনে এসে ওদেরকে (গায়িকাদের) ধমক দিলেন। তখন মহানবি নিজের পবিত্র মুখ হতে চাদর সরিয়ে হজরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন, "এদেরকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ কিছু বলতে যেও না), কারণ আজ ঈদের দিন। প্রতিটি জাতির জন্য ঈদ (অর্থাৎ আনন্দের দিন) অবশ্যই আছে এবং আজ আমাদের ঈদ (বা আনন্দের দিন)।"

আসুন, এই হাদিসটিরও সামান্য ব্যাখ্যা করা হোক এবং তারপরের যে হাদিসটি তুলে ধরবো ওটার ব্যাখ্যা ফেঁড়ে-চিঁড়ে তন্নতন্ন করে এবং প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার বিভিন্ন যুক্তির উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হবে।

এই হাদিসটি অনেকটা আগের বর্ণিত হাদিসের কাছাকাছি, তবে এখানে ব্যতিক্রম শুধু এটুকুই যে, মহানবি হজরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন যে, আজ আমাদের আনন্দের দিন এবং আরো মনে করিয়ে দিলেন যে, এই আনন্দের দিনটি কিন্তু প্রত্যেক জাতির

মধ্যেই আছে এবং আমাদেরও আছে। সুতরাং আজকের দিনটি আমাদের আনন্দের দিন। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির আনন্দের দিন আছে এবং তারা আনন্দ করে, কিন্তু আমরা কি মুখ গোমড়া করে বসে থাকবো? সবার আনন্দ করার অধিকার থাকলে আমরা কেন আনন্দ করবো না?

এবার আমরা যে হাদিসটি বর্ণনা করবো সেই হাদিসটি *তিরমিজি শরিফ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের দুইশত নয় হতে দশ পৃষ্ঠায় আছে এবং *মেশকাত শরিফ*-এর পাঁচশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় এবং *আবু দাউদ শরিফ*-এও আছে। হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আবু বোরায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবি কোনো একটি যুদ্ধ হতে একবার ফিরে আসার সময় কালো রঙের একজন দাসী (হাবসি যুবতী দাসী) মহানবির সামনে এসে বললো যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (আ.), আমি নজর মেনেছিলাম যে, (মানত করেছিলাম) আপনাকে নিরাপদে আল্লাহ্ ফিরিয়ে আনলে আমি আপনার সামনে দফ বাজিয়ে গান করবো। মহানবি বললেন, যদি তুমি মানত করে থাক তাহলে বাজাও (অর্থাৎ তোমার মানত পুরা কর), নতুবা নয়। তারপর মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতে লাগলো। তারপর হজরত আবু বকর (রা.) আসলেন এবং সে (মেয়েটি দফ) বাজাতে লাগলো। তারপর মাওলা আলী এলেন, সে বাজাতে লাগলো। একটু পরেই হজরত উসমান (রা.) এলেন এবং মেয়েটি বাজাতে লাগলো। যখন হজরত ওমর (রা.) আসলেন তখন মেয়েটি দফটিকে পাছার নিচে রেখে বসে পড়লো। সেই সময় মহানবি বললেন, 'ওমর তোমাকে শয়তানও ভয় করে। আমি বসেছিলাম আর এই মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতেছিল। আবু বকর, আলী এবং উসমানের আগমনের পরও সে দফ বাজাতেছিল। হে ওমর, যখন তুমি আসলে তখন সে দফটি রেখে দিল।' এই হাদিসটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কারণ এই হাদিসটিকে অনেকে সহি

হাদিস বলে মেনে নিয়েও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইচ্ছে করে ভুল করে ফেলে। ইচ্ছে করে বললাম এ জন্য যে, এদের চোখ থাকতেও কানা সাজে আর বিবেক থাকতেও বিবেকহীনের ভূমিকা পালন কেমনভাবে করে সে বিষয়েই সামান্য আলোচনা করতে চাই। তারা একটা খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করায় এই বলে যে, যেহেতু হজরত ওমরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়ে নিতম্বের নিচে দফটিকে লুকিয়ে রাখলো আর ঠিক সেই সময়েই মহানবি হজরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমাকে শয়তানও ভয় করে এবং এই 'শয়তানও তোমাকে ভয় করে'-কে পুঁজি করে গান বাজনাকে হারাম হবার প্রমাণ করে এবং বলে যে ইহা শয়তানি কাজ বলেই দফ বাজিয়ে গান গাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কী চমৎকার যুক্তির বহর! মহানবি এবং অপর তিনজন সাহাবার মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান শোনার সময়টিকে কী ফতোয়া দেবেন? দফ বাজিয়ে গান শোনা যদি হারামই হয়ে থাকে তাহলে মহানবি এবং অপর তিনজন সাহাবা কেন শুনলেন? বিষ কি আগামীকাল অমৃত হয়ে যায়? বিষ চিরদিনই বিষ থাকে। পছন্দ না হবার ফতোয়া এক রকম আর হারাম হবার ফতোয়া অন্য রকম।

এই হাদিসটি হতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভাল মানত করলে উহা পূরণ করতে হবে। কারণ, মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান শোনাবার মানত করেছিল এবং সেই মানতটি ভাল বলেই পূরণ করতে মহানবি মানা করলেন না। বরং বলা হল, যদি মানত করেই থাক তাহলে কর, নতুবা করো না। মেয়েটি যদি মদ্যপান অথবা কোরানে বর্ণিত যে কোনো হারামের উপর মানত করতো তাহলে অবশ্যই মহানবি তা বারণ করতেন। যেহেতু দফ বাজিয়ে গান গাওয়া হারাম না সেইহেতু মহানবি সেই মেয়েটিকে মানত পূরণ করতে বললেন।

এই হাদিসটি হতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, যে দফ বাজিয়ে গান গাইবার মানত করেছিল সে কিন্তু বালক, যুবক, প্রৌঢ় অথবা

একদম বৃদ্ধ পুরুষ নয়; সে হল একজন যুবতী নারী। কোনো নাবালিকা অথবা বৃদ্ধাও নয়। সুতরাং যুবতী নারীরা এ যুগে বাদ্যসহ গান গায় তাহলে হারাম হয় কেমন করে এবং পুরুষেরা যদি সেই বাদ্যসহ গান শোনে তাহলে সেটাও কী করে হারাম হয়? নিয়তের উপরই ভাল-মন্দ নির্ভর করে। সুতরাং নিয়ত যদি ভাল হয় তাহলে মেয়েদের বাদ্যসহ গান গাওয়া এবং পুরুষদের শোনার মধ্যে দোষ কোথায়? নিয়ত খারাপ করে কোরান পাঠ করার প্রমাণ এবং তার পরিণতি কী হতে পারে হজরত ওমরের খিলাফতের সময়ের ঘটনাটির কথা মনে করুন তো। হাদিস শরিফে আছে যে মহানবি বলছেন, 'পাপ কাজের মানত পূর্ণ করাও পাপ। নেক কাজের মানত আদায় করাও নেক।'

হজরত আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী (র.) মেশকাত শরীফের *শরহে লোম্‌য়াত* নামক কেতাবে লিখেছেন যে, 'এই হাদিসের দ্বারা মেয়েদের গান গাওয়া জায়েজ বলে প্রমাণিত হয়েছে, যদি ফেতনার ভয় না থাকে।'

দারকুতনী শরিফ-এ এই হাদিসটি বর্ণিত আছে যে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবি হজরত হাসান ইবনে সাবেতকে নিয়ে কোনো স্থানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মহানবির সাহাবারা চুপ করে বসে আছেন এবং ওখানে একটি মেয়ে, যার নাম শিরিন, সে মেজমার নামক (এক প্রকার) বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ঐ সাহাবাদের মাহফিলে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে ছিল। এমন সময় মহানবি ঐ মাহফিলে এলেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোনো আদেশ অথবা নিষেধ কিছুই করলেন না।

মহানবি শিরিন নামের মেয়েটির কাছে এলে শিরিন জানতে চাইলো যে, 'মহানবি, আমার জন্য গানবাদ্য করার দরুণ কোন ক্ষতি হবে কি?' মহানবি হেসে বললেন, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোনো ক্ষতি হবে না।' এই হাদিসটির সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে

লক্ষ্য করুন যে, দুই-একজন সাহাবা নয় বরং বেশ কয়জন সাহাবা চুপ করে বসে গান শুনছেন এবং যে গান গাইছে সে কিন্তু পুরুষ নয়, একজন যুবতী নারী। এই যুবতী কি বিবাহিতা না অবিবাহিতা ইহার উল্লেখ হাদিসটিতে নেই। তবে যুবতীটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে শিরিন। সে যে বাদ্যযন্ত্রটি বাজিয়ে গান গেয়েছে সেই বাদ্যযন্ত্রটি কিন্তু আরবের বহুল প্রচারিত সেই যুগের 'দফ' নয়। এখানে মেয়েটি দফ বাদ্যযন্ত্রটি না বাজিয়ে আর এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছে এবং সেই বাদ্য যন্ত্রটির নাম হল 'মেজমার'। সেই শিরিন নামক যুবতী মেয়েটি কিন্তু বসে বা একই স্থানে দাঁড়িয়ে গান গায় নি বরং সাহাবাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে গান গাইতেছিল। মহানবির সাহাবাদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু সব সাহাবাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং যে সাহাবারা বসে শিরিন নামক যুবতীর গান শুনেছেন এবং নিশ্চয়ই সেই যুবতীটি বোরখা পরে গান শোনান নি বরং যতটুকু শালীনতার দরকার ততটুকু পোশাক শিরিন নামক যুবতীটির শরীরে অবশ্যই ছিল। সুতরাং একটি যুবতী যদি শালীনতার পোশাক পরে এই যুগে পুরুষদের সামনে গান গায়, তাহলে কী ফতোয়া দেব? হাদিসটিতে আরো একটু লক্ষ্য করুন যে, সেই ঘুরে ঘুরে গান গাওয়ার সময় মহানবির আগমন এবং মহানবির এই গান গাওয়ার বিষয়টির উপর মন্তব্য অতি পরিষ্কার। মহানবি কিন্তু এসে কোনো প্রকার আদেশ অথবা নিষেধ করলেন না, তথা হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। বরং সেই শিরিন নামক যুবতীটিই মহানবির সামনে এসে জানতে চাইলো যে মহানবি, আমার জন্য গানবাদ্য করার দরুণ কোনো ক্ষতি হবে কি? মহানবি হাসলেন এবং বললেন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোনো ক্ষতি হবে না। মহানবির এই স্পষ্ট বক্তব্যটির ব্যাখ্যা দেবার কোনো দরকার মনে হয় না। কারণ, ইহা সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, মহানবি শিরিন নামক যুবতীটিকে

কী উপদেশ দিলেন এবং এই উপদেশটি কি সর্বযুগের সর্বকালের শিরিন নামক গায়িকার মত অন্যান্য গায়িকাদের জন্য প্রযোজ্য নয়? বিশ্বনবির উপদেশ-বাণী কি বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বজনীন নয়?

তেরবানি এবং *নেসাই শরিফ*-এ উল্লেখিত আর একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন যে, মহানবির কাছে একটি মেয়ে আসলে মহানবি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আয়েশা, তুমি এই মেয়েটিকে চেন কি?' আমি চিনি না বলাতে মহানবি বললেন, 'এই মেয়েটি অমুক গায়িকা। তুমি কি এর গান শুনতে ভালবাস?' হজরত আয়শা বললেন, হাঁ ভালবাসি। তারপর সে গান গেয়ে শোনাল।

মহানবি জানতেন, যে মেয়েটি এসেছে সে একজন গায়িকা। মা আয়েশা জানতেন না বলেই মহানবি প্রশ্ন করেছিলেন। যখন সেই মেয়েটি একজন গায়িকা বলে মহানবি মা আয়েশাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিয়েই মহানবি চুপ করে থাকেন নি বরং প্রশ্ন করলেন যে, এই সদ্য পরিচয় করিয়ে দেওয়া গায়িকার গান শুনতে ভালবাসে কিনা। মা আয়েশা গান পছন্দ করেন বলেই বললেন যে গান তাঁর শুনতে ভাল লাগে। তারপর এই পরিচয় করিয়ে দেওয়া মেয়েটি গান গেয়ে শোনাল।

বোখারি শরিফ এবং *মেশকাত শরিফ*-এ এই হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে, হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নতুন বিবাহিতা একটি যুবতীকে (তার স্বামী) একজন আনসারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে মহানবি বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে গানবাজনা কি নেই? কারণ, আনসারেরা (মদিনাবাসীরা) গানবাজনা পছন্দ করে থাকেন।'

এই হাদিসটি হতে প্রমাণিত হচ্ছে, আনসারেরা তথা মদিনাবাসীরা যে গানবাজনা পছন্দ করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, স্বয়ং মহানবিই তাঁর পবিত্র মুখ হতে এই গানবাজনা

পছন্দ করার কথা বললেন। আর এই হাদিসটি আমরা এমন এক হাদিস শরিফে পাচ্ছি যাকে কোরানের পরই মুসলমানেরা একবাক্যে স্থান দিয়ে থাকেন। সুতরাং হাদিসটির গুরুত্ব অস্বীকার করার প্রশ্নই উঠে না। নববধূ স্বামীর ঘরে যাচ্ছে অথচ সঙ্গে গানবাজনা নেই দেখে মহানবি সামান্য অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের সঙ্গে গানবাজনা কি নেই?' প্রশ্ন হল, মহানবি কেন এই গানবাজনার কথা মনে করিয়ে দিলেন? গানবাজনা যদি হারামই হতো তাহলে মনে করিয়ে দেওয়া এবং প্রশ্ন করার কথাই উঠে না। বরং নববধূর সঙ্গে গানবাজনা মহানবি অবশ্যই মানা করে দিতেন। যেমন মদ পান করা হতে বিরত থাকার জন্য মহানবি বার বার বারণ করে দিতেন অথচ সঙ্গীত বিষয়টি কেবল মনেই করিয়ে দিলেন না বরং আনসারেরা যে সঙ্গীত ভালবাসেন সেই কথাও মহানবি ঘোষণা করে দিলেন। এই হাদিসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন হজরত শায়খুল মোহাদ্দেসীন আবদুল হক দেহলভী তাঁর রচিত কেতাব *আশ শোয়াতোল্ লোমাত শরহে মেশকাত*-এর তৃতীয় খণ্ডের এক শত সতেরো পৃষ্ঠায়।

এবনে মাজা শরিফ-এর দুই শত চৌষট্টি পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) আনসারদের মধ্যে তাঁর এক আত্মীয়াকে বিবাহ দিলেন। মহানবি ঘরে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলেন, 'যুবতীটিকে কি তার স্বামীর ঘরে তুমি পাঠিয়ে দিয়েছ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ পাঠিয়ে দিয়েছি।' মহানবি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনো গায়িকা কি তার সাথে পাঠিয়েছ?' তিনি বললেন, 'না'। তারপর মহানবি বললেন 'আনসারেরা গান পছন্দ করে। সেই যুবতীটির সঙ্গে একজন গায়িকা তুমি কেন পাঠালে না, যে তার স্বামীর বাড়ি গিয়ে গান গাইতো?'

এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দিতে গেলে আগের হাদিসটির ব্যাখ্যার মতই হয়। তবে এখানে মহানবি মা আয়েশাকে স্পষ্ট বলে দিলেন যে,

সেই নব বিবাহিতা যুবতীটির সঙ্গে একজন গায়িকা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এ জন্যই উচিত ছিল যে আনসারগণ গানবাজনা পছন্দ করে।

এখন যে হাদিসটি বর্ণনা করছি ইহা সহি রেওয়ায়েতের সহি এবনে মাজা শরিফে এবং ইমাম বোখারি ও ইমাম মোসলেম শরিফে ঐ রাবিগণ হতে হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছেন। হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আনাস (রা.) বলেছেন, মহানবি মদিনার কোনো গলি দিয়ে একসময় যেতেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, কিছু বালিকা হাতে তালি দিয়ে এটাই গাইতেছিল যে, বনি নাজ্জার গোত্রের বালিকা আমরা। মহানবি আমাদের প্রতিবেশী। তাই আমরা কত বড়ই না ভাগ্যবতী। তখন মহানবি তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদের কতটুকু ভালবাসি সেটা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন।'

এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দেবার কি প্রয়োজন মনে করেন? একটু চিন্তা করলেই এই হাদিসটির বক্তব্য পরিষ্কার বুঝা যায়। তবে আরবেরা এই আধুনিক যুগেও যত বাদ্যসহই গান শুনুক না কেন, হাতে তালি তারা দেবেনই। কারণ, হাতে তালি দেওয়া তাদের দেশের একটি বিশেষ রেওয়াজ। আরবি বিখ্যাত গায়ক আর গায়িকা বিশেষ করে এই যুগে যেমন সামিরা তৌফিক, উম্মে কুলসুম এবং আবদুহুর গান শুনলে হাতে তালি দেবার রেওয়াজটা যে আগের মত হুবহু রয়ে গেছে তা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে। আরো একটি মজার কথা হল যে, আরবদের বিবাহে আমাদের দেশের হিন্দুদের বিবাহে যেমন উলুধ্বনি দেয় সে রকম তারাও দেয়। এই উলুধ্বনি দেওয়া প্রাচীনকাল হতেই আরবদের মধ্যে চালু ছিল এবং এখনো ঠিক তাই আছে। অথচ বাংলাদেশের কোনো মুসলিম পরিবারে এ রকম উলুধ্বনি বিবাহে দেবার কল্পনাও করে না। কারণ, বাংলাদেশের মুসলমানেরা এটাকে হিন্দুদের প্রথা বলে মনে করে। মহানবির কন্যা

খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা নিজেই যে উলুধ্বনি দিতেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ অনেক কেতাব হতে পাওয়া যায়।

আর একটি হাদিস *তফসীরে আহাম্মদী*-র ছয় হতে দশ পৃষ্ঠায় পাই, কিন্তু কোন হাদিস শরিফে এই হাদিসটি আছে তা উল্লেখ করা হয়নি। তফসিরে আহাম্মদীতে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমার কাছে একটি যুবতী গানবাদ্য করতেছিল। মহানবি ঘরে প্রবেশ করলে সেই যুবতীটি একইভাবে গানবাদ্য করছিল। তারপর হজরত উমর (রা.) প্রবেশ করলে সে বন্ধ করে দিল। মহানবি ইহা দেখে হাসলেন। হজরত উমর (রা.) মহানবিকে হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মহানবি ঐ দাসীর কথা তাঁর (উমরের) কাছে বললেন। হজরত উমর (রা.) বললেন, মহানবি যা শুনেছেন আমিও উহা না শুনে এখান থেকে যাব না। মহানবির আদেশে ঐ গায়িকা হজরত উমর (রা.)-কে গান শোনান।

হাদিসটির ব্যাখ্যা ইচ্ছা করেই দেওয়া হল না। কারণ, ইহা তফসীরে আহাম্মদীতে এমনভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো দলিল-প্রমাণ সামনে রেখে অথবা কোনো হাদিস শরিফের উল্লেখ না করে বলা হয়েছে। সুতরাং ইহা তফসিরকারকের ব্যক্তিগত মতামত কিনা অথবা গান বাজনাকে হালাল প্রমাণ করার জন্য নিজের বানানো হাদিস কিনা তা যেহেতু জানতে পারলাম না সেই হেতু এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দেওয়া হাস্যকর ব্যাপারই মনে করি। কারণ, আইনের মানদণ্ডে ইহা টিকে না। আমি কেবল এ রকম একটি হাদিসের উল্লেখ তফসীরে আহাম্মদীতে পেলাম বলে জানিয়ে দিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করলাম। এভাবে গানবাজনার উপর আরো কথা আছে এবং থাকতে পারে যা কেবল বর্ণনা করে যাব। কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়া হবে না। হাদিস শরিফের নাম থাকলে ব্যাখ্যা কম-বেশি অবশ্যই দেওয়া হবে।

ইমাম বায়হাকি *দালায়েলুন নবুওয়াত*-এ লিখেছেন এবং ইমাম গাজ্জালী তাঁর অমর গ্রন্থ *এহ্‌হিয়াউল উলুম*-এ লিখেছেন যে, তবুকের যুদ্ধ হতে যখন মহানবি ফিরে এলেন তখন মদিনার মেয়েরা একটি আরবি কবিতা দফ বাজিয়ে এবং হাতে তালি দিয়ে গেয়েছিল।

রেসালা সামায় নামক কেতাবের লেখক কাজী সানাউল্লা পানিপথী লিখেছেন যে, একসময় হজরত উমর (রা.) এক গলি (সরুপথ) দিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় তিনি বাজনার শব্দ শুনে প্রশ্ন করলেন, এখানে কী হচ্ছে? তাঁকে জানানো হল যে, এখানে খাতনার উৎসব হচ্ছে। তিনি কিছু না বলে চলে গেলেন। যেহেতু ইহা হাদিস নয়, কারণ ইহা হজরত উমরের কথা বলা হয়েছে, সেইহেতু বলার কিছু থাকে না। তবে যেহেতু হজরত উমর (রা.) একজন খুবই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা সেইহেতু হয়তো কিছু বলা যায়। কিন্তু এই বক্তব্য কতটুকু সমর্থনযোগ্য সেটার প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সে রকম প্রশ্ন উঠলে আমার বলার মত কিছু নেই।

কাজী সানাউল্লা পানিপথী আর একটি সুন্দর কথা লিখেছেন তাঁর ঐ একই কেতাবে যে, বিবাহ ঘোষণার জন্য যদি বাজানো জায়েজ বা মোস্তাহাব হয় তাহলে ঢোল, তাম্বুরা, নাকারা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদির মাঝে পার্থক্য এমন কী থাকতে পারে? খারাপ নিয়তের জন্য সবই যদি হারাম হয়, তাহলে ভাল নিয়তের জন্য সবই কি হালাল হবে না? দফ এবং অন্যান্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মাঝে তারতম্য করার কোনো মানেই হয় না এবং ইহা একটি বোকামির পরিচয় দেওয়া মাত্র।

মহানবি যে সকল কাপড় ব্যবহার করতেন সেগুলোর বুনন পদ্ধতির সঙ্গে এ যুগের কাপড়ের বুনন পদ্ধতির মাঝে কোনো মিল তো দূরের কথা, কৃত্রিম আঁশের তৈরি টেট্রন, পলিস্টার, কেরলিন ইত্যাদির তৈরি জামা ব্যবহার করে সুন্নতি লেবাসের দাবি করি। যুগের

পরিবর্তনে দ্রব্যের পরিবর্তন হবেই। সুতরাং সে যুগে আরবদের মধ্যে যে কয়টি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল উহা আমাদেরকেও এ যুগে বাজাতে হবে বললে লোকে মাথা খারাপ বলবে কি-না?

মিজানুল এয়েতেদাল নামক বিখ্যাত উসুলে হাদিসের প্রথম খণ্ডের আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় এবং হজরত শেখ মোহাদ্দেস দেহলভী *মোদারেজুন নবুয়াত*-এ লিখেছেন যে, 'ইমাম বোখারি, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহম্মদ হাম্বল ও ইমাম শাবা এবং অনেক মোহাদ্দেসের গুরু হাদিস শরিফের হাফেজ হজরত ইব্রাহিম ইবনে সায়াদ 'উদ' নামক বাদ্যযন্ত্রের সহিত গান শুনেছেন। যখন তিনি বাগদাদে এলেন তখন হাদিস শোনার জন্য খলিফা হারুন-উর-রশীদ অনুরোধ জানালেন। তিনি উদ আনতে বললেন। খলিফা বললেন, গন্ধযুক্ত উদ নামক কাঠ জ্বালাবার জন্য কি আনবো? তিনি বললেন, তারযুক্ত উদ নামক বাদ্যযন্ত্র চাই। খলিফা আনলেন এবং তিনি উদ বাজিয়ে গান করলেন। তিনি আরো বললেন যে, যাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন তারা কেবল হারাম জানবে। এই কথা শুনে খলিফা প্রশ্ন করলেন যে, সঙ্গীত বিষয়ে ইমাম মালেক হতে কোনো প্রকার বক্তব্য শুনেছেন কি? তিনি বললেন আল্লাহ্র কসম! আমি এটুকু জানি যে, বনি ইয়ার বাহার এক নিমন্ত্রণে অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল। সেই দাওয়াতের মজলিসে উদ এবং অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল এবং সেই লোকেরা গাইতেছিল এবং বাজাইতেছিল। সেখানে হজরত ইমাম মালেকের হাতে চার কোণ বিশিষ্ট একটি দফ ছিল। তিনিও ইহা বাজাইতে ছিলেন এবং গাইতেছিলেন।'

উপরের বর্ণিত কথাগুলোর ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। কারণ, ইহা হাদিস নয়। তবে হজরত ইব্রাহিম ইবনে সায়াদের মত বিখ্যাত এবং শ্রদ্ধেয় আলেম যেখানে খোদার কসম করে বলছেন যে, ইমাম মালেক দফ বাজিয়ে গান করেছেন, সেখানে কী

করে অবিশ্বাস করা যায়? এরপরও যদি কেউ সঙ্গীত বিষয়টিকে অস্বীকার করতে চায় তাহলে বলার কিছু নেই। *মসনদে ইমাম আহ্‌মদ*-এ বলা হয়েছে যে, মহানবির সামনে একজন হাবসি এক সময় দফ বাজিয়ে নাচতেছিল এবং গাইতেছিল যে, 'রসুলুন মোহাম্মাদুন্ আবদুন্ সালেহুন'। মহানবি প্রশ্ন করলেন যে, সে কী বলছে? সে বললো, আমি বলছি, 'রসুলুন মোহাম্মদুন্ আবদুন্ সালেহুন।'

ইহা যেহেতু হাদিস সেইহেতু সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। লক্ষ্য করুন, একজন হাবসি কেবল দফ বাজিয়ে গাইলো না বরং গান ও বাজনার সঙ্গে নাচতেছিল। সুতরাং গানের সঙ্গে নাচার দলিল পাওয়া গেল। তাই গানের সঙ্গে যদি কেউ নৃত্য করে তা মোটেই দোষণীয় নয় বরং জায়েজ এবং নৃত্য হালাল হবার অকাট্য দলিল পাওয়া গেল। যদি নৃত্য করা হারাম হত তাহলে অবশ্যই মহানবি সেই হাবসিকে বারণ করে দিতেন। ইমাম আবদুল বার রচিত বিখ্যাত কেতাব *আলএস্‌তিয়াব*-এ বলা হয়েছে, এবং জাহাবি ও শাবি হতেও একই রকম বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজরত মাবিয়া (রা.) ও হজরত উমর ইবনুল আস (রা.) বলেছেন যে, সাহাবা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের নিকট উদ নামক বাদ্যযন্ত্রসহ উভয়ে গান গাওয়া শুনেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) এমনকি নিজের দাসীদের গান শুনতেন এবং দাসীরা এক প্রকার তার দিয়ে বাঁধানো বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গান করতেন। ইহা মাওলা আলীর সময়ের কথা। এই বিখ্যাত কিতাবটিতে আরো বলা হয়েছে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) গানবাজনাকে কোনো প্রকার মন্দ কাজ বলে জানতেন না।

এই কথাগুলোর কোনো ব্যাখ্যা চলে না। কারণ, ইহা হাদিস নয়, তবে যারা ইসলামের উপর গবেষণা করেন তারা জানেন যে, ইমাম আবদুল বার একজন বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ এবং তাঁর রচিত

বিখ্যাত কেতাব *আলএসতিয়াব*-এর মূল্য কতখানি। পাঠক ভাইদেরকে একটি কথা এখানে বলার আছে। সেটা হল, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) মহানবির চাচাতো ভাই। মহানবি তাঁকে খুবই আদর করতেন। মহানবি তার মাথায় এবং মুখমণ্ডলে বহুবার চুমো খেয়েছেন এবং বিশেষ দোয়া করেছেন। তা ছাড়া অন্যান্য বহু সাহাবারা এবং তাবেইনগণ খুবই শ্রদ্ধা করতেন। যদি গানবাজনা হারামই হতো তাহলে এ রকম মহান সাহাবার পক্ষে কি হারাম কার্য করা সম্ভব?

অধম লেখক যদি হাজারও দলিল প্রমাণ দিয়ে গানবাজনাকে হালাল বলে দেখিয়ে দিতে পারে এবং হাদিসগুলোর খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেও বুঝিয়ে দেয় তবু কিছু সংখ্যক মানুষ ইহা গ্রহণ করতে চাইবে না। এটা একপ্রকার এলার্জি রোগ কিনা জানি না। তবে এ রকম কিছু গানবাজনা-বিরোধী লোক না থাকলে সবই একাকার হয়ে যায়। সব বিষয়ের এবং সব দর্শনের বিরোধিতা না থাকলে হৈ চৈ নামক কথাটি আর থাকে না। সুতরাং হৈ চৈ এবং সমালোচনা ভাল। তাই বলে একে অপরকে কাফের-মুনাফেক ফতোয়া দেওয়া এবং এই ফতোয়ার দরুন মারামারি কাটাকাটি করা জঘন্য অপরাধ। গানবাজনা শুনতেই হবে এবং গানবাজনা না শুনলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় না যারা বলেন তারা যেমন উগ্র মেজাজী, তেমনি গানবাজনা শোনা হারাম বলাটাও একই রকম শোনায়। অনেক অলীয়ে কামেল জীবনে হয়তো গানবাজনা শোনার প্রয়োজনই অনুভব করেননি, আবার অনেক অলীয়ে কামেল গানবাজনার মধ্যে বিভোর হয়ে থাকতেন। সুতরাং আমাদের এইসব সামান্য বিষয়গুলোর মতবিরোধগুলো কমবেশি থাকবেই এবং এইসব মতবিরোধগুলোকে সম্বল করে মুসলমানদের বিরাট ঐক্যের মাঝে যে অপূরণীয় ফাঁক তৈরি হয়েছে তা অচিরেই অবসান করতে হবে। যার যার মাজহাব অনুসরণ করে ইবাদত করতে দিন। আমাদের

সকলের কণ্ঠে একটি স্লোগান ধ্বনিত হোক আর সেই স্লোগানটির ভাষা হোক, 'আমরা যে কোনো ফেরকারই হই না কেন, আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল আমরা সবাই মুসলমান।'

খাজানা এবং *কাফি* নামক বিখ্যাত ফেকার কেতাব দুটোতে বলা হয়েছে যে, 'গানবাজনায় খারাপ নিয়ত থাকলে উহা হারাম হবে, কিন্তু ভাল নিয়তে গানবাজনা করলে উহা হালাল হবে।'

মাত্র কয়েকটি কথার মধ্যে দিয়ে গানবাজনার উপর সুন্দর মন্তব্য করা হয়েছে।

তারিখে মোগান্নী নামক প্রসিদ্ধ কেতাবের লেখক আবুল ফুরজ ইস্পাহানি এবং *মোবারেদ* নামক কেতাবের লেখক আবুল আস লিখেছেন যে, 'হজরত হাসান ইবনে সাবেত (রা.) উদ নামক বাদ্যযন্ত্রের সহিত গান শুনে দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে এবং ভাবের মাঝে ডুবে নাচতেছিলেন।' *জাখিরা ফেকাহ* নামক কেতাবে বলা হয়েছে যে, 'দফের বাজনা শোনা, নৃত্য করা এবং সঙ্গীতের রাগরাগিনী শোনার মধ্যে যদিও ঝাঁজ থাকে, কিন্তু হারাম নহে।'

হাক্কুল মোবিন নামক কেতাবে হজরত মাওলানা সাঈদ মোজাদ্দাদি লিখেছেন যে, ঢোলক, তাসা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি তবলের মত এবং প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে এবং থাকবেই।

এমৃতা কেতাবের লেখক উদ নামক বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জেনে অন্য সকল বাজনার যন্ত্রগুলোকেও হালাল জেনেছেন। *ইসতিয়াব* নামক কেতাবের লেখক মাওলানা আবদুর রব বলেছেন যে, গানবাজনা শোনার মধ্যে কোনো দোষ নেই। *মাদারেজুন্ নবুয়ত* নামক কেতাবের পাঁচ শত ষোল পৃষ্ঠা হতে একুশ পৃষ্ঠায় সঙ্গীত যে হালাল তার প্রমাণগুলো দলিল ও যুক্তিসহ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হজরত ইব্রাহিম ইবনে সায়াদ সেই যুগে ইলমে ফেকার বিখ্যাত

ইমাম ছিলেন। তিনি প্রথমেই সঙ্গীত শ্রবণ করতেন এবং পরে ছাত্রদেরকে হাদিস পড়াতেন। ইনি সেই বিখ্যাত ইমাম যিনি খলিফা হারুন-উর-রশীদের দরবারে প্রকাশ্যে সঙ্গীত হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছেন যে, হজরত ইমাম মালেক চারকোণওয়ালা একটি দফ বাজিয়ে গান করেছেন। *কেতাবে তাজকেরাত*-এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরিকে সঙ্গীত হালাল না হারাম এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তাঁরা বললেন, সঙ্গীত নির্দোষ। ছোট এবং বড় কোনো গুণাহ এর মধ্যে নেই। ইমাম আবু হানিফা যে সঙ্গীত শুনতেন তার বিস্তারিত বিবরণ এই কেতাবে লেখা আছে। পরে অবশ্য ইমাম আবু হানিফা যে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বলেছেন উহা ঘৃণিত এবং নোংরা গান। শর্ত অনুসারে যে সঙ্গীত হারাম হয় সেই সঙ্গীতকেই ইমাম সাহেব হারাম বলে মনে করার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সঙ্গীত শ্রবণে এমন হাল হতো যে তিনি একটানা দালানের ছাদের উপর নাচতেন। ইমাম সাহেবের ছেলে হজরত আবদুল্লাহ হতে এর বিশদ বর্ণনা পাই যাহা *মাদারেজুন্নবুয়ত* নামক কেতাবের পাঁচ শত আঠারো পৃষ্ঠায় লেখা আছে। এই বিখ্যাত কেতাবটি যিনি লিখেছেন তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বজনমান্য হজরত মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী।

ইমাম আবদুল গণি নাবলেসি হানাফি সাহেবের কেতাব *ইজা হোদ্‌দালালাত*-এ পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীত হারাম নয়। সঙ্গীত দূষিত হতে পারে কেবল শ্রোতা, গায়ক এবং বাদকের দোষে। সঙ্গীতের সঙ্গে যদি অশ্লীলতাকে জড়ানো হয় তখনই সঙ্গীত দোষণীয় বলে গণ্য হবে। কেবল এই ধরনের অশ্লীলতাসহ সঙ্গীতকে প্রত্যেক ইমামই দোষণীয় বলেছেন। কিন্তু যে সঙ্গীত নির্মল এবং নির্দোষ সেই সঙ্গীতকে ইমামগণ কেবল হালালই জানতেন না, বরং নিজেরাও শুনতেন।

দাউদ তাই নামক কেতাবে বলা হয়েছে যে, হজরত দাউদ তাই নিজে সঙ্গীতের মাহ্ফিলে হাজির থেকে বিভোর হয়ে সঙ্গীত শ্রবণ করতেন। সবচেয়ে মনে রাখার মত বিষয় হল, হজরত দাউদ তাই ছিলেন ইমাম আবু হানিফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং ফেকা শাস্ত্রের বিরাট আলেম।

হজরত নাসির উদ্দিন আবুল বজ এস্কান্দারী ফেকা শাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম ছিলেন এবং তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি সঙ্গীত ভাল পরিবেশে এবং ভাল লোকের দ্বারা হয় তবে জায়েজ আছে।

জামে নামক কেতাবের লেখক কারি আবু বকর খেলাল এবং আবদুল আজিজ বলেছেন যে, দোষণীয় নয় বলে প্রমাণিত সঙ্গীত হালাল।

সঙ্গীত যে জায়েজ এই বিষয়টির উপর বিস্তারিত যুক্তি ও দলিল দ্বারা সুন্দরভাবে প্রমাণিত করে গেছেন হজরত আবু ইবনে খোররম তাঁর লেখা বিখ্যাত *মোফাসসালাত* নামক কেতাবে। এই *মোফাস্সালাত* নামক কেতাবটি এতই সুনাম অর্জন করেছিল যে, দামেস্কের মুফতি শায়খুল উলামা হজরত আবদুর রহমান কাদরি শাফেয়ি এবং হজরত শেখ তাজ উদ্দিন পর্যন্ত ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বিখ্যাত *শামি* কেতাবের পঞ্চম খণ্ডের দুই শত সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় সঙ্গীত হালাল হবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই কথাটি স্পষ্ট ভাষায় *শামি* কেতাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'অবশ্যই কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রকৃতপক্ষে হারাম হতে পারে না। শ্রোতা এবং বাদকদের খারাপ উদ্দেশ্যের জন্যই হারাম হয়ে যায়।' *শামি* কেতাবের ফতোয়াটি কিন্তু অপূর্ব। আমরা যদি এই আধুনিক যুগে ফতোয়াটি সামান্য বুঝিয়ে বলতে চাই যে, দালান, প্রাসাদ, মসজিদ, পায়খানা মাটি পুড়িয়ে যে ইট বানানো হয় সেই ইট দিয়েই বানানো হয়। মসজিদ বানানোর জন্য যে ইট ব্যবহার করা হয় সেই একই

ইট দিয়ে মসজিদের জন্য প্রস্রাব ও পায়খানা বানানো হয়। এখন ইটের কী দোষ? যারা ইটের অবস্থান যেখানে যেভাবে বসিয়ে দিয়েছে তাদেরকে দোষ দেব, না ইটের দোষ দেব? এভাবে আমরা প্রত্যেকটি বিষয়কে আমাদের মনের ভাল এবং মন্দের মানদণ্ডে কি বিচার করে দেখতে পারি না?

আবার *শামি* কেতাবের পঞ্চম খণ্ডের তিনশত সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, সঙ্গীত এবং নৃত্য এই দুটো হালাল এবং হারাম কিনা এ বিষয়ে অকাট্য দলিল প্রমাণের দ্বারা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বহু কেতাবে। *এহ্ইয়ায়ে উলুম* এবং *আওয়ারেফুল মারেফ*-এ সঙ্গীত যে হালাল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হজরত আল্লামা নাহরীর ইবনে কামাল বা-শা (র.) সঙ্গীত বিষয়টির উপর জ্বালাময়ী ভাষায়, ব্যাখ্যায় এবং দলিল প্রমাণের মাধ্যমে হালাল প্রমাণ করে গেছেন। এবং এইসব বিখ্যাত কিতাবগুলো আজও বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে অনুবাদ করে প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করা তো দূরে থাক বরং সুফিবাদের গলা টিপে কেমন করে খুন করা যায় সেই ফন্দিফিকির আবিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকে। তবে বাংলার মাটিতে বাবা লালন ফকিরের গান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সুফিবাদ বেঁচে থাকবে। যদি রবীন্দ্রনাথ আর কাজী নজরুলের মত লালনগীতি প্রতিদিন টেলিভিশনে প্রচার করা হত তাহলে মানুষ কলুষিত বস্তুবাদের মায়াজালে আটকিয়ে থেকেও আত্মার প্রশ্নে বিনয়ে মনের অজান্তে মাথা নত করে দিত। লালনের গান হৃদয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত হানে সেই রকম কি অন্য কোনো বাংলার বিখ্যাত কবির গান এক শতাংশ আঘাত দিতে পারবে?

ইমাম সারখাসির রচিত কেতাব *বাহারোরায়েক*-এ বলা হয়েছে যে, বিবাহ, বিদেশ হতে ঘরে আসার সময় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আশায় অবশ্যই সঙ্গীত জায়েজ।

খাজানা এবং *কাফি* নামক দুইটি কেতাবে বলা হয়েছে যে, 'অসৎ উদ্দেশ্যে সঙ্গীতকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (অবশ্য অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য অনেক ভাল কাজও হারামে পরিণত হয় এবং হারাম বলে ফতোয়া দেওয়া হয়ে থাকে)। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং বিবাহ উৎসবে, জেহাদে উৎসাহ দিতে গিয়ে, এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় হানাফি মাজহাব অনুসারে কখনোই হারাম হবে না।'

ফতোয়ায়ে আলমগীর নামক কেতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের দুই শত একুশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফকে দফ বাজানো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বিবাহ উৎসবে মেয়েরা অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া নিজেদের সন্তানদের জন্য দফ বাজানোকে আপনি কি মকরুহ মনে করেন?' ইমাম সাহেব বললেন, 'না, আমি এটাকে কখনো মকরুহ মনে করি না।'

মহিত সরখসি এবং *খাজানাতোল মুফতিন* নামক কেতাব দুইটিতে এই বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে যে, 'ঈদের দিন দফ্ বাজনাতে কোনই ক্ষতি নাই।'

সিয়ারুল আখতাব নামক বিখ্যাত কেতাবের তেপান্ন পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হজরত মামসাদ উলুবের দায়নুরি (র.) সঙ্গীত শুনতেন এবং তরিকতের পীরে কামেলদের ওরশ মোবারক পালন করতেন। প্রত্যেক ওরশ শরিফে তিনি সঙ্গীতের আয়োজন করতেন এবং নিজে সঙ্গীত শুনতেন দেখে একজন লোক প্রশ্ন করেছিল, আপনি যে সঙ্গীত শোনেন, এতে যদি কোনো প্রকার মারেফতি রহস্য থেকে থাকে তবে খুলে বলুন। ইহাতে হজরত বললেন যে, 'সঙ্গীতের ভেতর যে রহস্য লুকিয়ে থাকে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি কেবল মহানবি ও মাওলা আলীর এবং আমাদের মাননীয় অলীয়ে কামেলেরা যে সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন উহারই সুন্নত পালন করেছি।'

সিয়ারুল আখতাব নামক কেতাবের সাতান্ন পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হজরত খাজা আবু ইসহাক সামি চিশতি অতিরিক্ত সঙ্গীত শুনতেন।

তিনি বলতেন, সঙ্গীত হৃদয়কে ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে তোলে এবং আপন রবের রহস্যের রূপ ধরা দিতে থাকে। কারণ সঙ্গীত হৃদয়কে কোমলতার দিকে এত দ্রুত এগিয়ে নেয় যে, 'আমার, আমার' এবং 'আমি, আমি'-র স্বকীয়তা হারিয়ে যেতে থাকে।

একই কেতাবের সাতষট্টি পৃষ্ঠায় হজরত শেখ আবু আহমদ বলেছেন, 'সঙ্গীতের মাঝে এমন গোপনীয় রহস্য লুকিয়ে থাকে যা সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে না। হাল্কাভাবেই সাধারণ লোকেরা সঙ্গীতকে গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ লোকেরা সঙ্গীতের গভীরে প্রায়ই যেতে পারে না, যার দরুণ সঙ্গীত শ্রবণে একজনকে কাঁদতে দেখা যায়, আবার আর একজনকে হাসতে দেখা যায়। সঙ্গীতের নেয়ামত এমনই একটি বড় নেয়ামত যে সমঝদারের কাছে এর চেয়ে প্রিয় নেয়ামত আর কী হতে পারে?' ঐ একই কেতাবের একাশি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হজরত খাজা মউদুদ চিশতি প্রায় সময়ই সঙ্গীত শ্রবণে বিভোর থাকতেন। তাঁর সঙ্গীতের মাহফিলে [illegible] আলেমদের আগমন হত। তিনি সঙ্গীত শ্রবণে মাঝে মাঝে [illegible]ওর মত কাঁদতে থাকতেন এবং তাঁর করুণ কান্নায় মজলিসের [illegible]নেকেই কাঁদতো। আবার তিনি সঙ্গীত শ্রবণে কখনো হাসতে থাকতেন। তিনি তাঁর মুরিদানদের বলতেন, 'সঙ্গীতের সুরে পূর্ণভাবে ডুবে যাবার পর আশেক তার "আমি, আমি" ভাবের লেবাসটি ফেলে দিয়ে মাশুকের লেবাস পরিধান করে মাশুকের মধ্যে ডুবে যান।'

'আমি, আমি', 'আমার, আমার' এই আমিত্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কমবেশি আছে এবং এই এক একটি আমিত্বের রূপ এক এক রকম প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। আমিত্ব যাহা ধারণ করে উহাই ধর্ম। সুতরাং বহু মানুষের বহু আমিত্ব এবং বহু আমিত্ব ধারণ করে আছে বহু ধর্ম। এই বহু ধর্মগুলোকে ত্যাগ করে, বর্জন করে, একমাত্র আত্মসমর্পণের ধর্মে তথা আল্লাহ্‌র একমাত্র ধর্ম ইসলামে

আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত কোনো ধর্মই বাতিল হয় না এবং হবার প্রশ্নই উঠে না এ জন্য যে, তিনি আদম হতে মহানবি পর্যন্ত মাত্র একটি ধর্মই পাঠিয়েছেন আর সেই ধর্মটির নাম হল আত্মসমর্পণের ধর্ম তথা ইসলাম ধর্ম। মানুষের 'আমি, আমি' ভাবটির দ্বারা যে মানুষ অগণিত ধর্ম রচনা করে, করছে এবং করবে কেবল এগুলোই বাতিল হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। তাই তো অধ্যাত্মবাদের গুরুদেব হজরত বাবা লালন ফকির সবচাইতে বেদনাদায়ক, সবচাইতে হৃদয়ে ধাক্কা দেয় যে কথাটি, সেই কথাটি বলে গেলেন, 'লালন তো লালনকেই চিনতে পারলো না, লালন মরে জল পিপাসায় থাকতে নদী মেঘনা।' লালনের এই কথা কয়টি সূরা কালামের একটি আয়াতকেই যেন কেন্দ্র করে বলা হয়েছে, *নাহ্নু আক্‌রাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ।*

সঙ্গীতের মর্যাদা এবং মূল্যায়ন যে কত উঁচুতে স্থান লাভ করেছে *সিয়ারুল আখতাব* নামক কেতাবটি পড়লেই পরিষ্কার বুঝা যায়। এই কেতাবটির অনুবাদ যদি করা হত তাহলে সঙ্গীতের উপর যা-তা মন্তব্য করতেন না। আসলে সঙ্গীত বিষয়টির উপর বহু মুল্যবান কেতাব আছে যেগুলোর বাংলা ভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন ছিল।

অতি সাধারণ মুসলমান বলেও যার বদনাম আছে, অথবা যাকে শুনে মুসলমান বলে অপবাদ দেওয়া হয়, অথবা বাপদাদা মুসলমান ছিল বলে তাকেও বিশ্বসমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে মুসলমান বলে পরিচিতি লাভ করতে হয়েছে, সে রকম মুসলমানটিও বেশ ভাল করেই জানে যে, মহানবির পবিত্র দাঁত কোন একটি যুদ্ধে শহিদ হয়েছিল এবং এই পবিত্র দাঁতের জন্য কয়েক শত মাইল দূরে বসবাস করা মহানবির একজন আশেক তথা প্রেমিক পাথরের আঘাতে আঘাতে সব কটি দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন। সত্যি, শুনতেই অবাক লাগে, মন ভয়ে শিউরে উঠে যে একটি নষ্ট হয়ে

যাওয়া দাঁত তুলতে হলে অবশ করে তারপর তুলতে হয়, আর তরতাজা পুরো বত্রিশটি দাঁত তুলে ফেলা কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর কত বড় আশিক হতে পারলে এ রকম সুন্নতটি পালন করতে পারেন? ভোজন পর্ব শেষ করে মিষ্টি খাওয়াও মহানবির একটি সুন্নত। গায়ে খুস্‌বু লাগানো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাও একটি সুন্নত, কিন্তু এ রকম ভয়াবহ সুন্নত মাত্র একজন আশিকই পালন করেছেন। যিনি এ রকম ভয়াবহ সুন্নতটি পালন করেছিলেন তাঁর মহানবিকে জাহেরী সুরতে দেখার সৌভাগ্যটি হয়নি এবং যতদূর মনে হয়, দাঁত ভাঙার সময় সেই প্রেমিকের বাতুনি চোখটি খোলা ছিল না (?) তথা আমরা যাকে কাশ্‌ফ খোলা বলি সেটা ছিল না। কারণ মারেফতি চোখ খোলা থাকলে তিনি কেবল একটি দাঁতই ভাঙতেন, এতোগুলো দাঁত ভাঙবার প্রয়োজন ছিল না। অথবা বাতুনি চোখ খোলা অবশ্যই ছিল, কারণ মারেফতের রহস্যকে ঢাকার আদেশ পেয়েছিলেন বলে। কারণ, নবি এবং অলীরা আল্লাহ্‌র রহস্যময় জুব্বার ভেতর থাকেন, তাই তাঁদের কেবল আল্লাহ্‌ পাক এবং তাঁরা তদ্রূপ আল্লাহ্‌কে চেনেন। আর কারো পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। যেমন এই পৃথিবীতে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ সরল একটি হল, সিংহই জানে এবং বুঝে যে একটি বাঘের শরীরে কতটুকু শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু একটা ইঁদুর কি তা জানতে এবং বুঝতে পারে? অসম্ভব। এখন বলতে হবে যে, দাঁতগুলো ভাঙতে গিয়ে সেই আশেকের অনেক রক্ত মাটিতে ঝরেছিল। সেই আশেক থাকতেন করন প্রদেশে। নাম তাঁর ওয়ায়েস করনি। মজ্জুব বলেই তিনি করন প্রদেশে সুপরিচিত ছিলেন। মহানবিকে যাঁর দেখার ভাগ্য হয়নি এবং শত শত মাইল দূর হতে এবং সেদিনের পথ ঘাটের অবস্থা অনুযায়ী বেশ কিছুদিন পর মহানবির পবিত্র দাঁত শহিদ হবার কথাটি লোকমুখে শুনেছিলেন। মহানবির শেষ কয়টি আদেশের মধ্যে এটিও একটি

আদেশ ছিল যে, তাঁর পবিত্র শরীরের ব্যবহার করা জামাটি ওয়ায়েস করনিকে উপহার দিতে। যিনি মহানবির পবিত্র শরীরের জামা পাবার যোগ্যতা বহন করেন তিনি নিশ্চয়ই জান্নাতি। এই কথা না বললেও সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারেন ওয়ায়েস করনির মর্যাদা কত উঁচুতে। যেমন হাতের আঙ্গুল কারো আয়না দিয়ে দেখতে হয় না, ইহা তেমনি পরিষ্কার বুঝা যায়। কারণ, জান্নাত হতেও কি মহানবির পবিত্র শরীরের পবিত্র জামা উপহার পাওয়া অনেক বেশি দামি নয়? আমার এক বাতের রোগী যিনি মোল্লা এবং গান বাজনার বিরম্নদ্ধে, তাকে আমি 'দফ' বাজিয়ে গান করার হাদিসটি দেখালাম। উনি হাদিসটি দেখে হাসিমুখে মেনে নিলেন এবং বললেন যে, মহানবির আমলের সেই দফ নামক বাদ্যযন্ত্রটি দিয়ে যদি গান শোনাতে পারেন তাহলে শুনতে আপত্তি থাকবে না। সেই দিনের দফ নামক বাদ্যযন্ত্র যা প্রায় দেড় হাজার বছর আগে চালু ছিল তা জোগাড় করা আমার পড়্যে সম্ভব নয় বলে জানালাম। উনি বললেন যে, তাহলে কেমন করে গান বাজনা শুনি! আমি বললাম, আপনি যে বাতের বেদনায় ভুগছেন সেটার জন্য আমি বেঁধে দিয়ে শরীরের যে অংশে বাতের বেদনা বেশি সেখানটায় ছুরি দিয়ে কেটে কেটে শিঙ্গা লাগিয়ে দূষিত রক্ত বের করে দেবো। কারণ শিঙ্গা লাগানো সুন্নত এবং অনেক হাদিসে সেই কথাটি আছে। এই আধুনিক যুগের বেরিন সাইটামিন, ব্রম্নফেন, নরজাসিস পন্ডস্টোন, রাস টক্স, কস্টিকাম, ক্যালমিয়া ল্যাট, সাইলিসিয়া খাবেন বাতের ব্যাথা হতে মুক্তি পাবার জন্য অথচ গান শুনবেন সেই যুগের 'দফ' নামক বাদ্যযন্ত্র দিয়ে? শুধুমাত্র সেই যুগের বাদ্যযন্ত্র যদি সুন্নত হয় তাহলেতো এই যুগের ঔষধগুলো বেদাত হয়ে যায়। খাবেন বেদাতের ফসল আর গান শুনবেন সেই যুগের বাদ্যযন্ত্র দিয়ে! অঙ্কতো মিলছে না। হিসাবটা গরমিল হচ্ছে না?

সমগ্র কোরান শরিফের কোথাও গান-বাদ্যের বিরম্নদ্ধে একটি শব্দও

উচ্চারিত হয় নি। কেবল মাত্র দুইটি শব্দের শাব্দিক ব্যাখ্যা নিয়ে অনুবাদকারীর বিভিন্ন মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। কোরান শরিফের যে দুইটি শব্দকে ভিত্তি করে অনেক শ্রদ্ধেয় ভায়েরা গান-বাদ্য নাজায়েজ করেছেন সেই শব্দ দুইটি হলো *'লাহওয়াল হাদিস'*। উহা সূরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়াতে আছে। আরবি লাহওয়াল শব্দের বাংলা অর্থ হলো বাজে তথা অসাড় এবং হাদিস অর্থ হলো কথা। দুইটি মিলে শাব্দিক অর্থ দাঁড়ালো বাজে কথা। এই 'অসাড় বা বাজে কথা'কেই মূলধন করে কেউ গান-বাদ্যকে বুঝিয়েছেন, আবার কেউ কবিতাকে বুঝিয়েছেন, আবার কেউ গান-বাদ্য এবং কবিতা দুটোর একটিও বোঝায় নি বলে মন্তব্য করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন যেহেতু নবি হযরত দাউদ (আ.) গান-বাজনা করতেন এবং তাঁর মধুর সুরে এমনকি পশুপাখি পর্যন্ত আসতো সেহেতু 'লাহওয়াল হাদিস হাদিস' বলতে গান-বাদ্যকে বোঝানো হয় নি, যেহেতু তিনিও একজন অতি সম্মানীয় নবি। অনেকে আবার এ বলেও মন্তব্য করেছেন যে, যেহেতু গান-বাদ্যের আরবি ভাষায় প্রতিশব্দ হলো *'গেনা'* সেহেতু গেনা শব্দটি কোরান-এর কোথাও একটিবারের জন্যও বলা হয় নি এবং যেহেতু বলা হয় নি সেহেতু লাহওয়াল শব্দটি যার অর্থ অনর্থক-বাজে-অসাড় এর দ্বারা গান-বাদ্যকে বোঝানো হয় নি। অনেকটা নানা মুনির নানা মতের মতো শোনায়।

ইসলামের অন্য কোনো দল অথবা তরিকায় গান-বাদ্য জায়েজ থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু চিশতিয়া তরিকা ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। চিশতিয়া তরিকার মধ্যেই কাওয়ালি, গজল, নাত, মুরশিদি, বাউল বিভিন্ন প্রকার গান-বাদ্য হয়ে আসছে। হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রধান শিষ্য, বিভিন্ন সুরের স্রষ্টা, হজরত আমির খসরম্ন চিশতি তার উজ্জ্বল এবং বিস্ময়কর প্রমাণ। হজরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি এবং হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া

চিশাতির মাজারে সব সময় কাওয়ালি, গজল, নাত ইত্যাদি হয়ে আসছে এবং মাজার শরিফের পাশেই নামাজ পড়ার জন্য মসজিদও রয়েছে। এশার নামাজ শেষে দিল্লিতে অবস্থিত হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া চিশাতির মাজারে গান-বাদ্য শুরূ হয়, কিন্তু আজমিরে অবস্থিত খাজা বাবার মাজারে এসব টাইম টেবিলের খুব কমই খেয়াল রাখা হয়। কারণ শত শত কাওয়াল একই সময়ে গান গেয়ে চলেছে। শত শত বাদ্য-বাজনার দল একই সময়ে বাজিয়ে চলেছে। হাজার হাজার লোক একই সময়ে জিকির করছে। হাজার হাজার লোক একই সময়ে কোরান পড়ছে, মিলাদ পড়ছে, দাঁড়িয়ে নেচে নেচে জিকির করছে, চিৎকার করে কাঁদছে। এ যেন এক আজব দরবার। এখানে যেন সব নদীর মিলনস্থল মহাসমুদ্র এবং মহাসার্বজনীন। এত বড় সার্বজনীনতার বিশাল প্রকাশ পৃথিবীর আর কোনো নবি-ওলির মাজারে আছে কি না আমার জানা নেই। কারণ এখানে পৃথিবীর এমন কোনো সম্প্রদায়ের লোক নেই যে আসা যাওয়া না করেন। সুতরাং খাজা বাবারই আপন ভাগিনা বলে কথিত হাইকোর্টের মাজারে যিনি আছেন সেই হজরত খাজা শরফুদ্দিন চিশতির মাজারে কাওয়ালি, গজল, নাত, মারেফতি এবং মুরশিদি গান বহু পূর্ব হতেই চলে আসছে। কিন্তু এখন মাজার কমিটিতে অন্য গোত্রের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় খাদেম প্রবেশ করে যে স্থানটিতে সবসময় কাওয়ালি হতো সেই স্থানটিকে মসজিদের ভিতর ফেলে দিয়েছেন এবং এখানেই ইহার শেষ না করে সমস্ত স্থানটিকে বেড়িবাঁধের মতো আটক করে সেই স্থান হতে কাওয়ালি গানের নাম-গন্ধ পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়েছেন। যদিও মাজার কমিটির ভেতর কয়েকজন শ্রদ্ধেয় খাদেম ইহাতে আপত্তি তুলেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো ফল হয় নি।

গান বাজনার পক্ষে হাদিস পাওয়া যায় প্রায় চব্বিশটি। হয়ত কিছু এদিক সেদিক হতে পারে। আবার গান বাজনার বিপক্ষেও আটটি

হাদিস পাওয়া যায়। এই পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে যে মুসলমান ভাইদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হবে এটা চতুর আব্বাসীয় রাজবংশ ভালো করেই জানতো। গান বাজনার পক্ষের দলিল যদিও অনেক বেশি কিন্তু বিপক্ষেও তো বড় বড় সাহাবা জাবির, আবু হুরায়রাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। মহান সাহাবা হযরত জাবিরকে দিয়ে তো উর্বর মাঠে ঘাস গজানোর পানি বলানো হয়েছে। সুতরাং কাকে কি বলবো? পক্ষের আলেমরা বড় বড় বই লিখে বোঝাতে চেয়েছেন। আবার বিপক্ষের আলেমরা বড় বড় বই লিখে বোঝাতে চেয়েছেন। আবার বিপক্ষের আলেমরা বড় বড় লিখে তারাও বোঝাতে চেয়েছেন। এখন ফলটা কী দাঁড়ালো? ভাই ভাই এই বিষয়টিতে একমত হতে পারলো না। অভিশপ্ত উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশ এভাবে তাদের পোষা আলেমদের দিয়ে কোরান হাদিসের উপর নানা রকম মতভেদ তৈরি করে রেখেছে। তাই গান বাজনার বিপক্ষে যদি মাদ্রাসার আলেম উলামারা নাজায়েজ ফতোয়া দেয়, তাহলে আমি দোষ দিতে চাইবো না। কারণ তাদের হাতেও আটখানা হাদিস রয়েছে এবং সরল বিশ্বাসে মহানবির বাণী বলে মেনে নিচ্ছেন। এতে গান বাজনার পক্ষের আলেম উলামারা আমাকে যত গালাগালি করুন না কেন, আমি আমার বিবেকের বিচারে বিরোধিতা করবো না। কারণ মাদ্রাসার সরল সহজ আলেম উলামারা দোষ করেনি, করেছে উমাইয়া আর আব্বাসীয় রাজবংশ। মুসলমান উম্মার তথা মুসলমানদের একতার মাঝে বড় বড় ফাটলের বিষবৃক্ষ তারাই রোপন করে গেছে। তাই গান বাজনার পক্ষে যদি মাদ্রাসার আলেম উলামারা জায়েজ ফতোয়া দেয় তাহলে আমি দোষ দিতে চাইবো না। কারণ তাদের হাতেও চব্বিশখানা হাদিস রয়েছে এবং সরল বিশ্বাসে মহানবির বাণী বলে মেনে নিয়েছে। তাই ইসলাম রাজতন্ত্রকে মারাত্মক বিষ বলে মনে করে গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে মীমাংসার উত্তম উপায় বলেছে।

রাজতন্ত্রের কথা মেনে নিলে মওলা আলীকে খলিফা করে যেতেন। গণতন্ত্রের মাধ্যমে হযরত আবু বকরকে তাহলে খলিফা নির্বাচিত করা হতো না। সাকিফার ঝগড়া, আনসারদের বিরোধিতা এবং মওলা আলীর নিরব সমর্থন যদি আমরা মেনে নেই, তাহলে গণতন্ত্রকেই মেনে নেওয়া হলো। গণতন্ত্র ছিল বলেই সাকিফাতে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। গণতন্ত্র ছিল বলেই, তা যত সীমিত আকারেই হোক না কেন, আনসাররা স্বাধীন ভাবে তাদের মতামত তুলে ধরতে পেরেছিলেন। এটারই নাম বাক-স্বাধীনতা। মহান সাহাবারা এই বাক-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই হযরত আবু বকর খলিফা হয়েছেন। এই বাক-স্বাধীনতাকে যারা পছন্দ করেন না তারাই মহান সাহাবাদের মাঝে নিগেটিভ মন্তব্য পেশ করে আরো অনৈক্য তৈরি করে চলছে। এটা ঠিক নয়। এটা যেন মরক্কোর বাদশা হাসানের মতো। মহানবির বংশতালিকা তৈরি করে উনিও নবিবংশের বলে ঘোষণা দেবার মতো। এটা যেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মতো। মহানবির বংশ তালিকা তৈরি করে উনিও নবিবংশের বলে ঘোষণা দেবার মতো।

দুই রাজবংশ তথা উমাইয়া এবং আব্বাসীয়রা আওলাদে রসুল তথা নবি বংশের উপর চালিয়েছে সব ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার এবং মসজিদে মসজিদে অভিশাপ দেবার খোতবা পাঠ। এরপর কি আশা করতে পারি? যারা নবি বংশকে কেবল হেয় প্রতিপন্ন করার চিকন কৌশলই আবিষ্কার করেনি, বরং একদম প্রকাশ্যে জনতার সামনে, মুসলমান ভাইদের সামনে, মহান সাহাবাদের সামনে প্রতিটি মসজিদে মসজিদে প্রতি সপ্তাহে জুম্মার নামাজের খোতবায় অভিশাপ দেওয়া হতো। দেড় হাজার বছর পর আকের মুসলামানরা তথা আমরা যখন এই অভিশাপ দেবার কথা ইতিহাসের পাতায় পড়ি, তখন সমস্ত শরীর এবং মন-প্রাণ ঘৃণায় রি! রি! করে উঠে।

প্রতিবাদ করার ভাষা খুঁজে পাই না। বলবেন, সেদিনের সাহাবারা এরকম অভিশাপ দেবার খুতবা শুনে কি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারেননি? স্বৈরাচার মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের সামনে প্রতিবাদ করার সাহস? খুনী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার ধৃষ্টতা? কোরানের উপদেশ–ভালো কাজে উৎসাহ দাও, আহ্বান করো, দাওয়াত দাও এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দাও, মানা করো, বিরত রাখার চেষ্টা করো ইত্যাদি যদি দাঁড়িয়ে কেউ শুনিয়ে দিতে চাইতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুন করা হতো, নির্মমভাবে হত্যা করা হতো, ঘাড়ের উপর মাথা তলোয়ারের আঘাতে নামিয়ে দেওয়া হতো। এরপরেও কি প্রতিবাদ? এর পরেও কি বাক-স্বাধীনতার প্রশ্ন আসতে পারে? যদিও ইসলাম সম্পূর্ণ গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাসী। কিন্তু সেই বিশ্বাস কি ছিল এবং আজও কি আছে? আজও কি কেউ মুক্ত মনে ইসলামের উপর গবেষণা চালিয়ে যাবার সাহস পায়? আজও কি দেখতে পাই না, আজও কি অবাক হই না, যখন মুমিনের দ্বারা ইসলামিক হুকুমত চালু করার কথা লিখে বাকস্বাধীনতার গণতন্ত্রের গলায় ছুরি চালাতে চায়? তাদের বিদ্যার বহর দেখে অবাক হই। কারণ মধ্যযুগীয় রাজবংশের রাজারা সিংহাসনে বসার আগে নিজের নামের আগে ও পরে কেবল মুমিন টাইটেলটি লাগিয়ে দেননি বরং মুমিনদের মুমিন (আমিরুল মুমিনিন) বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, তাও আবার হাজার হাজার ইসলাম বিষয়ে বিদ্বান আলেমদের সমর্থনে। সেই দিনের আলেমদের মতো কি আজও এই জাতীয় আলেম আমাদের মুসলিম সমাজে বাস করছে না? আওলাদে রসুল শহিদে আযম ইমাম হোসাইনের কাটা পবিত্র মস্তক মোবারক যখন শয়তান এজিদের সামনে আনা হলো, সেদিন কি তিনশত আলেমের ফতোয়া পড়ে শোনানো হয়নি? এজিদের তিনশত আলেমেরা কি ইমাম হোসাইনকে বাঘী তথা রাষ্ট্রদোহী ফতোয়া দেয়নি? শয়তান

এজিদ কি সেদিনের বড় বড় আলেমদের সমর্থন নিয়ে মুমিনদের মুমিন তথা আমিরুল মুমিনিন টাইটেলটি নামের আগে ব্যবহার করেনি? আজকের যুগের হযরত মাওলানা রশিদ আহম্মদ গংগোহী কি দেওবন্দ হতে প্রকাশিত ফতোয়ার কেতাব "ফতোয়ায়ে রশিদীয়া" তে শয়তান এজিদকে মুমিন বলে ঘোষণা দেননি? হযরত মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী কি এজিদের জঘন্য চরিত্রের কথা প্রকাশ করেননি? কিছু কিছু ভালো কথা কি স্পষ্ট ভাষায় মওলানা মওদুদী বার বার বলে যাননি? যদিও মওলানা মওদুদীর দেওয়া সব বিষয়ে একমত পোষণ করতে পারছি না, কিন্তু ঐ কথাগুলো কি একদম সত্য বলেননি? বাংলায় একটি প্রবাদ আছে "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা"। এই হীনমন্যতার ভাইরাস আমাদের মুসলিম সমাজে বেশ বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে বলে আজও এক পস্নাটফর্মে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারিনি! আমাদের আল্লাহ এক, নবি এক, কোরান এক, অথচ মুসলিম সমাজ এতো ফেরকায় বিভক্ত কেন? কেন একজনের ভালো এবং গ্রহণযোগ্য কথাগুলো গ্রহণ করে নিতে পারি না? বনের হাজার হাজার গরুর মাঝে যেমন মিল নেই এবং এই মিল না থাকার দরুন দুই তিনটা বাঘ দেখলে সবাই পালাতে থাকে, তখন বাঘ ঘাড় মটকিয়ে দু'একটাকে ধরে তাদের ভোজপর্ব শুরু করে। সবগুলো বনগরু যদি এক সঙ্গে বাঘকে পাল্টা ধাওয়া করতো, তাহলে বাঘই পালাবার সুযোগ পেত না। ডিশ এন্টেনার ডিসকোভারি চ্যানেলে এরকম দৃশ্য দেখে দেখে অবাক হই। আর ভাবি যে, বনগরুদের একতা নেই বলেই এহেন অবস্থ দেখতে হয়। গুটি কয়েক বাঘ নামের ওহাবিরা ভালো করেই জানে যে এদের মাঝে কোনো দিনও একতা আসবে না। কোথায় মওলানা রূমী, শামসেত্তাব্রীজ, ইমাম গাজ্জালী, গাউছুল আযম, খাজা বাবা, বাহাউদ্দিন আর সিরহিন্দ আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের দোহাই দেওয়া কিছু ফকিরেরা।

আমরা যেমন মোল্লা দিয়ে মোহাম্মদ কে, যাজক দিয়ে যিশু খ্রিষ্টকে, আর খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে মাপতে গিয়ে ভুল করি, তেমনি ওহাবি-বাঘের কামড় খেতে হবেই। সত্যি বলতে কি অধম লিখককে যদি স্বঘোষিত (আপন পিরের দেওয়া খেলাফত পাওয়ার সনদ থাকলে স্বঘোষিত হয় না) বলে গালি দেন, তাতে মনে মনে দুঃখ পেলেও কিছু বলবো না। কারণ প্রতিবাদ করার মন মানসিকতায় সব রকম উৎসাহ হারিয়ে ফেলার পথে দাঁড়িয়েছি। আজ আমাদের সবকিছু ভুলে গিয়ে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে। নতুবা ওহাবি-বাঘেরা একটি একটি করে ঘাড় মটকাবে আর আমরা সবাই দৌড়াতে থাকবো এবং ওহাবি-বাঘের ভয়ে উরস শরিফকে বাদ দিয়ে ইছালে ছওয়াব, পবিত্র ফাতেহা শরিফ, ইসলামী জলসা, বাৎসরিক সম্মেলন ইত্যাদি নামের ঢাল বানিয়ে গা বাঁচাতে চাইবো এবং এরই মধ্যে চাওয়া শুরু হয়ে গেছে। নিরপক্ষেতার ভান করিনি। যদিও নিরেপেক্ষতাকে সবাই পছন্দ করে। কিন্তু বিরুদ্ধে গেলই চোখ মুখ লাল হতে শুরু করে। যদি নিরপেক্ষই না হতাম তাহলে মওলানা মওদুদীর প্রশংসা লিখতে পারতাম না। নিরপেক্ষতা আপেক্ষিক সূত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। নিরপেক্ষতা কালের সঙ্গে চলে। আপেক্ষিক জগতের ছবিগুলো তথা বাস্তবের প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষতা নির্ভরশীল। নিরপেক্ষতাও পথ হারাতে পারে যখন বাস্তব চিত্রগুলোর উল্টো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। হিটলারের প্রচারমন্ত্রী ডক্টর গুয়েবলসের দর্শন শুনলে মনে হয় বাস্তব। তাই নিরপেক্ষতা কখনও কখনও হোঁচট খায় এবং এরকম অবস্থায় খেতে থাকে। ইহুদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক যখন হাজার হাজার হাদিস মহানবির নামে বানিয়ে ফেলেছে তখন এদের মাঝে কয়জন হাতে নাতে ধরা পড়ার পর আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল আজিজ (যাকে দ্বিতীয় উমর বলা হয়) বহু রকম অনুনয় বিনয় করলেন এবং এমনকি এটাও বললেন যে,

মৃত্যুদণ্ড দেওয়াতো দুরের কথা, বরং প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হবে এই শর্তে যে, মিথ্যা তথা জাল হাদিসগুলো বের করে দিতে হবে। কিন্তু তারা বরং মৃত্যুদণ্ডকেই হাসিমুখে বরণ করে নিলো। কিন্তু মিথ্যা তথা জাল হাদিসগুলো বাহির করে দিলো না। বরং খলিফাকে এই বলে চমকিয়ে দেওয়া হলো যে, আমরা আসলের সঙ্গে নকলকে এমন কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছি যে আপনি তো দূরের কথা কেউ কোনোদিন আসল আর নকল কোনটা ধরতেই পারবেন না! সুতরাং হাদিসের উপর সরল মনে নিরপেক্ষ থাকতে চাইলেও ঐ নিরপেক্ষতার মধ্যে ভুল থেকে যাবে এবং যাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষতায় থাকতে চাইলেও থাকা যায় না। যেমন গান বাজনার পক্ষে হাদিস পাবেন প্রায় চব্বিশটি এবং বিপক্ষেও পাবেন আটটি। তাহলে কেমন করে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন? তাই আজ আমরা ফেরকাবাজীর হাসপাতালে এক এক রোগে এক একজন ভুগছি। এই রোগ হতে মুসলিম জাহান কি একদিন মুক্তি পাবে না? বস্তুর বিজ্ঞান কি এই মহাভুল হতে একদিন আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না? নিরপেক্ষতাই ধর্মের মূলমন্ত্র। নিরপেক্ষতাই ধর্মের নামে হিংসা, মারামারিকে থামাতে পারে। তাই ধর্ম-নিরপেক্ষতাই হলো প্রকৃত ধর্ম। যেখানে ধর্ম-নিরপেক্ষতা নেই, সেখানে গোঁয়ার গোবিন্দের প্রেত-নৃত্য শুরু হয়। অসহায় মানুষেরা তখন ধর্মের নামে প্রাণ হারায়। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। জোর খাটাতে গিয়ে এ পর্যন্ত বহু মানুষ জীবন দিয়েছে। আর নয়! এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষকে তার প্রতিভা বিকাশ করার সুযোগ দিতে শুরু করেছে। সেদিন অতি কাছে আসছে যেদিন মানুষ মানুষকে জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে শিখবে, ধর্মের মাপকাঠি দিয়ে নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিমেষেই সবাইকে এক ধর্মে আনতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। বরং দলে দলে ভাগ করে রাখেন এবং মত ও পথে অমিল করে রাখেন। সূরা হুদটা পড়ে

দেখুন না কথাটিতে কতটুকু সত্যতা বহন করে! সমগ্র বাংলাদেশে, অবশ্য আমার জানামতে, একটি পীরের দরবার আছে যারা অন্য যে কোনো দরবারের পীর ফকিরদের সম্মান দিতে জানেন। এমনকি দেশের বড় বড় জ্ঞানীগুণীদেরকেও সম্মান দিতে দেখেছি। মতের অমিল বেমিল হোক না কেন, আদর্শের সঙ্গে গড়মিল থাক না কেন, তাতে কি আসে যায়? তবু এই পীরের দরবার সবাইকে সম্মান দিচ্ছেন এবং প্রতি বছর সেমিনার করে উচ্চ আসনে বসিয়ে উজ্জত দিয়ে চলছেন। সেই দরবারের নাম "হাক্কানী দরবার শরিফ"। ঝিগাতলা এবং মিরপুরে এর প্রধান কার্যালয়। হযরত পীরে কামেল বাবা আজানগাছী সাহেবের প্রধান খলিফা বাবা আবু আলী আক্তার শাহ কারান্দারের (কান্দাইলার)' নামে তাঁরই প্রধান খলিফা হযরত বাবা আনোয়ার শাহ্ কালান্দরের দরবার শরিফ। 'সাপ্তাহিক সংলাপ' পত্রিকাটি পড়ে দেখুন, অবাক হবেন! দেখবেন সব ফকির আলী দরবেশ হতে ইসলামিক চিন্তাবিদেরা সবাই স্বাধীনভাবে লিখছেন এবং কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই হুবহু ছাপিয়ে দিচ্ছেন। অথচ অন্য কোনো দরবার হতে এ রকম পাইনি। তবে আশা করি সব রকম গণ্ডির দেওয়াল ভেঙ্গে দিতে একদিন সবাই পারবে। পথ যখন দেখানো হয়েছে তা আজ হোক আর কাল হোক আমরা এরকম কিছু একটা আশা করতে পারবো।

বৈচিত্র্যতায় অবগাহন যারা করতে পারে, প্রসারতার পবিত্র দীপ্তি লুকিয়ে রাখতে চাইলেও পারে না, ধরা পড়ে যায়। যেমন উগ্র গন্ধজাত ফুল আপন গন্ধ নিজ বৃত্তে ধরে রাখতে পারে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে জীব আলিঙ্গন না করা পর্যন্ত যাকে আমরা বাস্তব বলে ধরে নেই, সেই বাস্তব শব্দটি আপেক্ষিকতার প্রাচীরে আবদ্ধ। বলে বিমূর্ত বলতে হয় না। মূর্তই অভিজ্ঞতার ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু বিমূর্ত তা পারে না। পারে কেবল অনুভূতির আলোড়ন

তুলতে। তাই বিমূর্ত বোবা। কিন্তু দহন প্রচণ্ড। নরক বিমূর্ত। কিন্তু দহন ভয়ংকর। দেখা যায় না। মনে হয় ঠিকই আছে। কিন্তু বিমূর্তের দহন যখন গলায় দড়ি পরিয়ে মৃত্যুকে ডেকে আনে তখনই দহনের ভয়ংকরতা কিছুটা বুঝতে পারি। মূর্তের কান্না স্থির নয়, আপেক্ষিক। স্থায়ী নয়, ভেসে যায়, এক পশলা বৃষ্টির মতো। আবার শান্ত হয়। পথ চলে। কাজ করে। বিস্মৃতির পাতলা আবরণে ঢেকে যায়। কিন্তু বিমূর্তের দহন মানুষকে খুন করে। অপরের দ্বারা নয়। কারণ অপরের দ্বারা হলে তা মূর্ত। নিজেকে নিজে খুন করে বিমূর্ত। যাকে আমরা আত্মহত্যা বলি। মূর্ত দৃষ্টি বুঝতেই পারে না সেই বিমূর্তের কতখানি গভীর বেদনা, কতখানি দহনের বোবা যন্ত্রণা। তাই বিমূর্ত নরক যন্ত্রণা যা হৃদয় মনকে গোপনে জ্বালায়। কিন্তু মূর্তের দহনে চিকিৎসা চলে। ভালো হবার প্রশ্ন থাকে। কিন্তু বিমূর্ত প্রশ্ন রাখে না। প্রশ্ন রাখার বিধান নেই। প্রশ্ন রাখার অভ্যাস বিমূর্তের নেই। কোরান কিন্তু বিমূর্তের দহনকেই জাহান্নামের আগুন বলেছে। চোখে দেখা যায় না অথচ জ্বলছে। কত বড় দুঃসহ বোবা জ্বালার দহন। বস্তুর বিজ্ঞান এই দহনের প্রশ্নে একদম বোবা। বার বার পথ খুঁজে কিন্তু তখনো মরীচিকায় হাবুডুবু খায়। আবার মানব শরীরের জিনকে দায়ী করার আবিষ্কারের সাধনায় গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। জানিনা আল্লহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ রহমত দান করে এর রহস্য উদঘাটন করায় কি-না। একথা আমি বলতে পারবো না। কারণ আমার জানা নেই। সময় কথা অনেক বলেছে। আরো বলে যাবে কি-না সময়ই কেবল জানে। লিখতে শুরু করলে মূল বিষয়টি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনের অজান্তে অন্য সব কথা বলে যাই। কেউ থামিয়ে দেয়, কেউ পারে না। আমি পারি না। তাই লিখি। গান বাজনার পক্ষ এবং বিপক্ষটা পরিষ্কার বোঝা যায়। কেউ মেনে নেয়, কেউ মানে না। যুগে যুগে হেকমত প্রকাশ হবে ধাপে ধাপে। যেমন বিজ্ঞান এগিয়ে চলছে

ধাপে ধাপে। রং মাত্র কয়েকটি। অথচ এই কয়েকটি রংকে মিশিয়ে মিশিয়ে ষোল বিলিয়ন রং-এর রূপ এ পর্যন্ত বানানো হয়েছে। আল্লাহ বলছেন, সময়ই আমি, তাই সময়কে গালি দিওনা। অবশ্য এটা অতি উঁচু মাপের কথা।

❖